শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষট্‌চত্বারিংশৎবর্ষ
দশম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৪০০

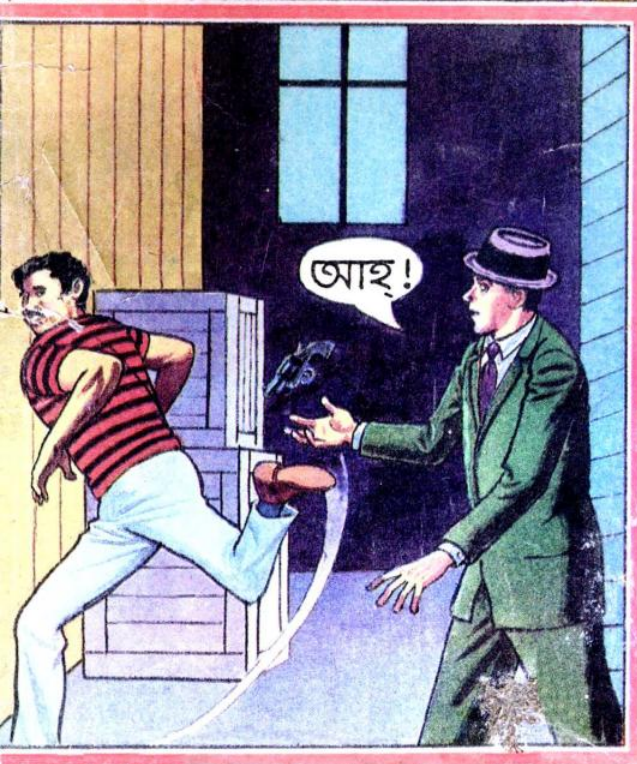

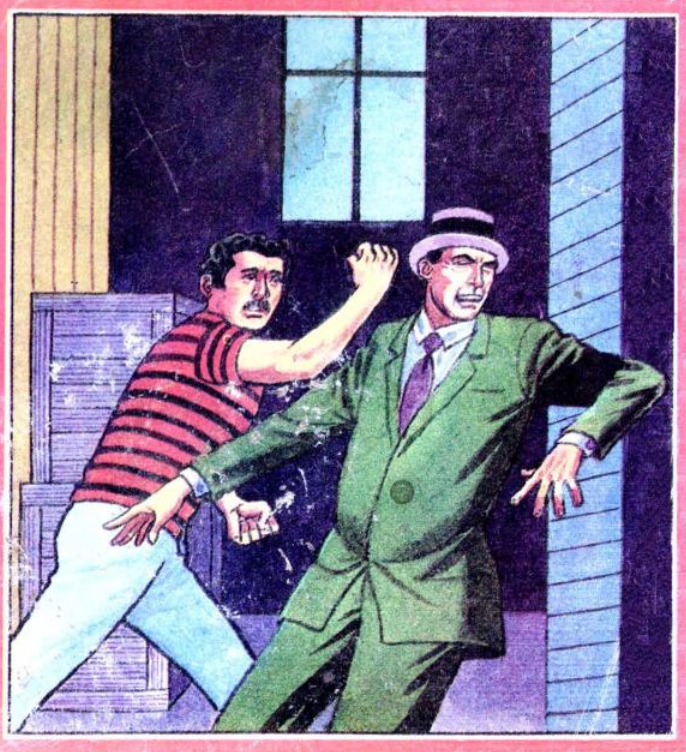

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু,
পিংকী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন
এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিংকী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকস্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাঁটুলদি গ্রেট

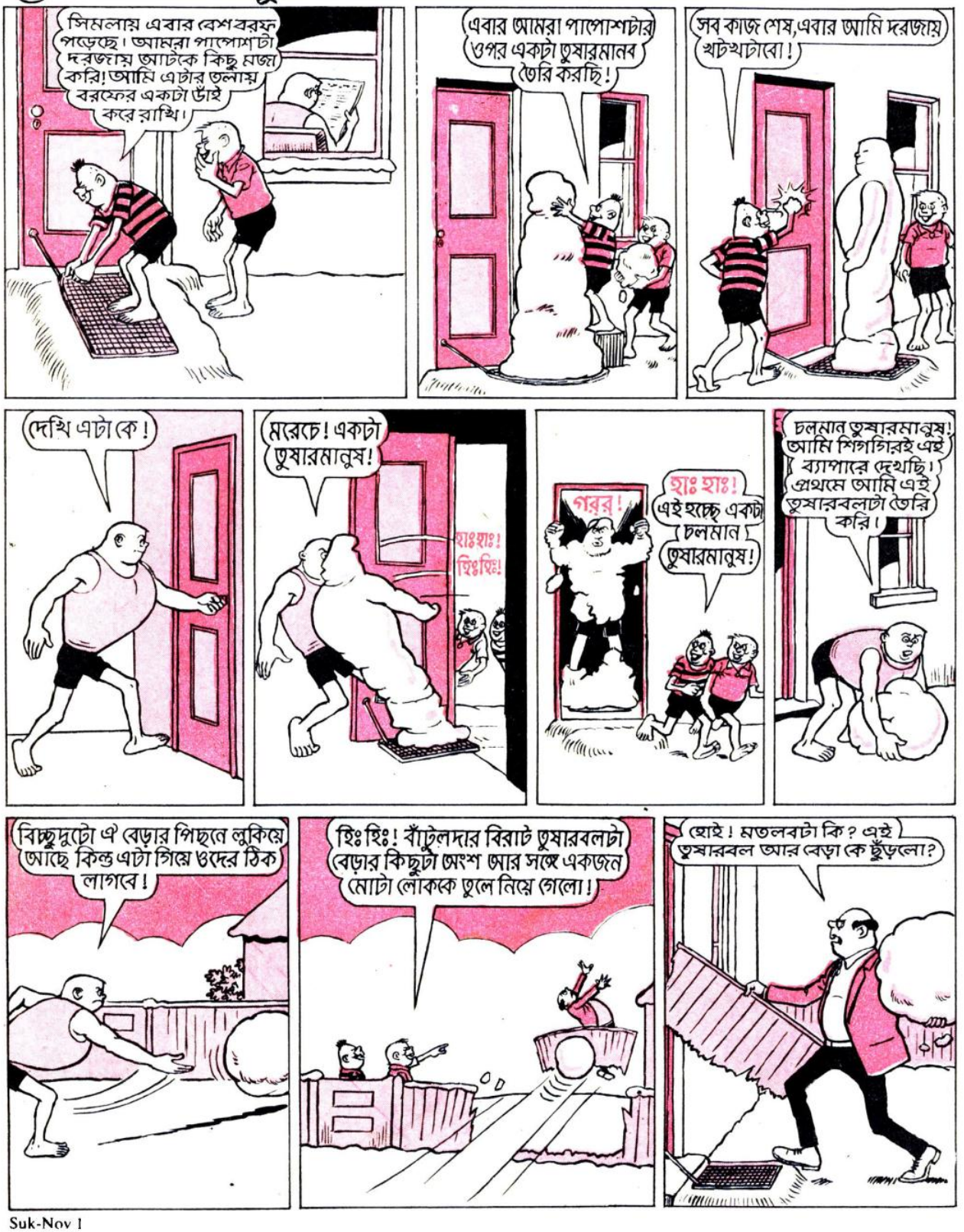
সিমলায় এবার বেশ বরফ পড়েছে। আমরা পাপোশটা দরজায় আটকে কিছু মজা করি! আমি এটার তলায় বরফের একটা ডাঁই করে রাখি।
এবার আমরা পাপোশটার ওপর একটা তুষারমানব তৈরি করছি!
সব কাজ শেষ, এবার আমি দরজায় খটখটাবো!
দেখি এটা কে!
মরেচে! একটা তুষারমানুষ!
হাঃহাঃ!
হিঃহিঃ!
গরর!
হাঃ হাঃ! এই হচ্ছে একটা চলমান তুষারমানুষ!
চলমান তুষারমানুষ! আমি শিগগিরই এই ব্যাপারে দেখছি। প্রথমে আমি এই তুষারবলটা তৈরি করি।
বিচ্ছুদুটো ঐ বেড়ার পিছনে লুকিয়ে আছে কিন্তু এটা গিয়ে ওদের ঠিক লাগবে!
হিঃহিঃ! বাঁটুলদার বিরাট তুষারবলটা বেড়ার কিছুটা অংশ আর সঙ্গে একজন মোটা লোককে তুলে নিয়ে গেলো!
হোই! মতলবটা কি? এই তুষারবল আর বেড়া কে ছুঁড়লো?

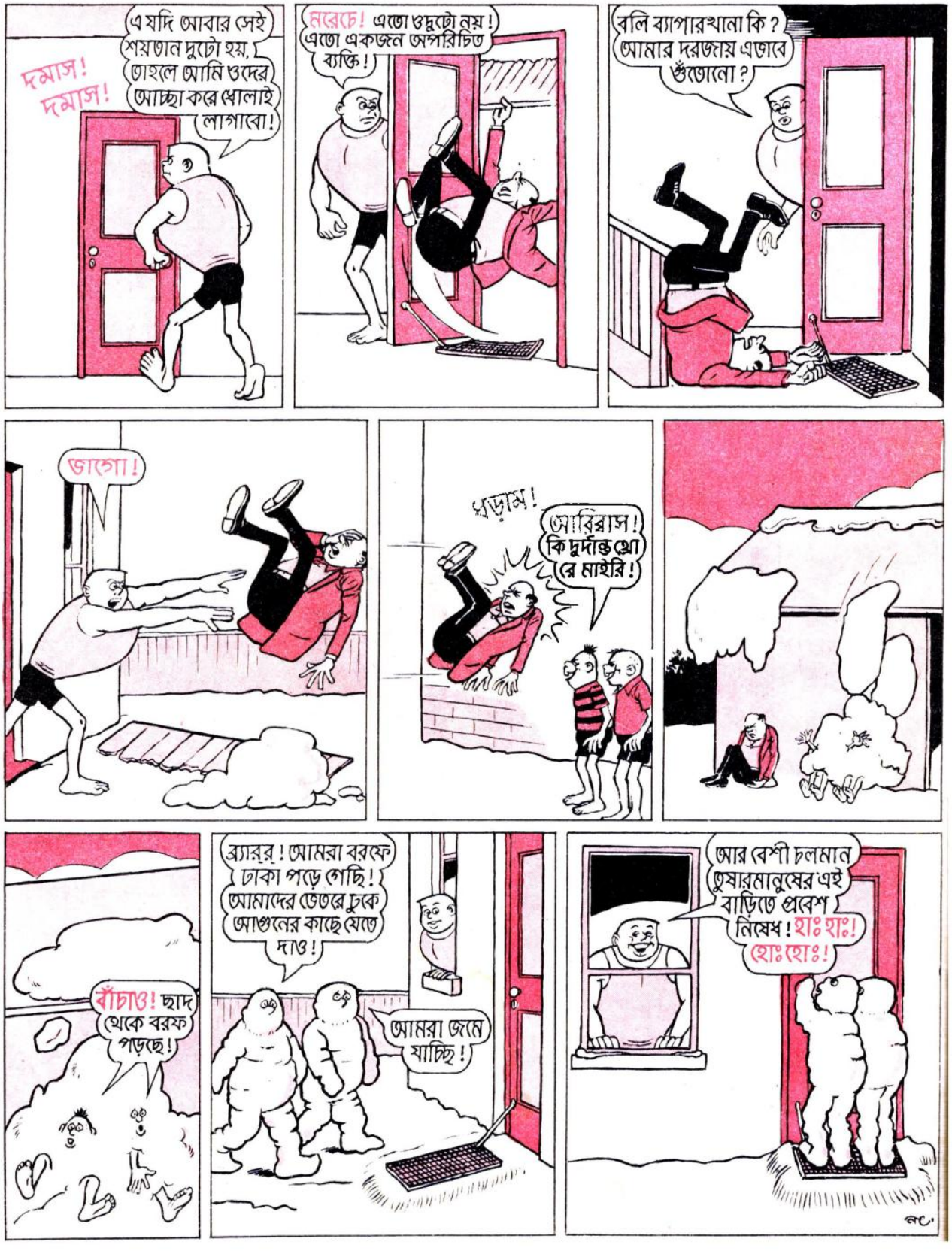
দমাস! দমাস!
এ যদি আবার সেই শয়তান দুটো হয়, তাহলে আমি ওদের আচ্ছা করে ধোলাই লাগাবো!
নরেচে! এতো ওদুটো নয়! এতো একজন অপরিচিত ব্যক্তি!
বলি ব্যাপারখানা কি? আমার দরজায় এভাবে গুঁতোনো?
জাগো!
ধড়াম!
সোরিরাস! কি দুর্দান্ত গো রে মাইরি!
বাঁচাও! ছাদ থেকে বরফ পড়ছে!
ব্র্যার্‌র্‌! আমরা বরফে ঢাকা পড়ে গেছি! আমাদের ভেতরে ঢুকে আগুনের কাছে যেতে দাও!
আমরা জমে যাচ্ছি!
আর বেশী চলমান তুষারমানুষের এই বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ! হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ ১৪০০
নভেম্বর ১৯৯৩

প্রচ্ছদ □
স্বর্ণখনির অন্তরালে—নারায়ণ দেবনাথ
শ্রদ্ধাঞ্জলি □
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ
—স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০
ধারাবাহিক □
অমাবস্যার রাতে (রহস্য উপন্যাস)
—শিশিরকুমার মজুমদার ৩০
অরণ্যপতি টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)
—সব্যসাচী ৩৮
সম্পূর্ণ রহস্য কাহিনী □
নৃপতি রহস্য—ধূর্জটি চন্দ ৬
গল্প □
ভয় থেকে ভূত—তুষার সরদার ৬৫
ভূতের গল্প □
হিলি ডাকবাংলোয়
—হিমাংশু সরকার ২৫
রূপকথার গল্প □
দুখন-সুখনের গল্প
—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ২১
হাসির গল্প □
যত্ত দোষ ঐ রিয়ার
—সুস্মিতা বিশ্বাস ১২
পুরস্কৃত গল্প □
উপহার (প্রথম)—তন্ময় চক্রবর্তী ৬৩
মেলার মজা (দ্বিতীয়)
—সমীর দেবনাথ ৬৩
জীবন থেকে নেওয়া □
দুষ্টু লোরার গল্প—আরতি বসু ৭০
বিজ্ঞান বিচিত্রা □
নিউরোনের জালে খগেনবাবু
—সুনীত রায় ৪৪
ফিচার □
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ২০
বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ৬৯
সত্যি ! ৪১
কবিতা □
খিদে পেলে বই খায়
—বিরাম মুখোপাধ্যায় ৬৮
বাগমারি না বাঘমারি
—তৃষিত বর্মণ ৫
বিভাগীয় লেখা □
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
পড়ার সঙ্গে খেলা—চন্দন রুদ্র ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৩৫
ছবিতে গল্প □
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন)
—ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪২
তিতলির যাদু-পুতুল—পল্লব
পূততুণ্ড ও দোলা পূততুণ্ড ৪৮
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ২৮
ঘোষণা □
নিতাইলাল সাহা স্মৃতি
সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৬৪
জানো কী ? ৪৭

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-I.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

অনুবাদ সিরিজ

বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন সংযোজন

জ্যাক লন্ডন-এর
হোয়াইট ফ্যাং
কল অব দ্য ওয়াইল্ড

রিচার্ড হেনরি ডানা-র
ট্যু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট

হেনরি হল কেইন-এর
দ্য বন্ড ম্যান

জোয়ান রুডলফ ওয়াইজ-এর
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

চার্লস কিংসলি-র
হাইপেশিয়া

এইচ, জি, ওয়েল্স্-এর
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্স্
ইনভিজিবল ম্যান
দ্য স্লীপার অ্যাওয়েক্স্

মার্ক টোয়েনের
অ্যাডভেঞ্চারস্ অব টম সইয়ার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্
এ কনেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থাস কোর্ট
দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর হ্যুগোর
লা মিজারেবল
টয়লার্স অব দ্য সী
হাঞ্চব্যাক অফ নৎরদাম
দ্য ম্যান হূ লাফ্স্

এরিক মারিয়া রেমার্ক
দি ব্ল্যাক অবলিস্ক
অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট

এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট

র‍্যাফেল সাবাটিনির
অ্যাক্রস দ্য পিরেনিজ
দি লস্ট কিং

চার্লস ডিকেন্সের
নিকোলাস নিকোলবি
এ টেল অব টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
ডেভিড কপারফিল্ড
অলিভার টুইস্ট

হেনরি রাইডার হাপার্ড-এর
দি মুন অব ইজরায়েল
কিং সলোমন্স্ মাইন্স্

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
কিডন্যাপ্ড
ব্ল্যাক অ্যারো
ট্রেজার আইল্যান্ড
ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড
দ্য বটল ইম্প

জুলে ভার্ণের
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ
রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডে

লাইটহাউস

ওয়াল্টার স্কট-এর
রব রয়
আইভ্যান হো
ট্যালিসম্যান
দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

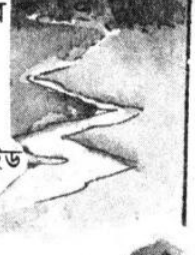

জেমস কুপারের
দ্য লাস্ট অব দি মহিক্যান্স্
দ্য পাথ ফাইন্ডার

জর্জ এলিয়টের
মিড্ল মার্চ
সাইলাস মার্নার

আলেকজান্ডার দুমার
থ্রি মাসকেটিয়ার্স
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
দি কন্সপিরেটর্স
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো
ব্ল্যাক টিউলিপ
কাউন্টেস দ্য চার্নি

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শুকতারা

৪৬শ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৪০০/নভেম্বর ১৯৯৩

বাগমারি না বাঘমারি

তৃষিত বর্মণ

ছুঁচো মেরে গন্ধ হাতে
হাজার ধুলেও যায় না সেটা,
মারতে হবে দু' চারটে বাঘ
বলবে লোকে—'বাপকা বেটা'!
যেতে হবে সোঁদরবনে
কিংবা যাব বাগমারি,
বাঘের বুকে পা চাপিয়ে
তুলব ফটো বাঘ মারি।

কি বললে? বাঘ মারবে?
এটা আবার কাজ নাকি?
কেজি দুয়েক বুদ্ধি নিলে
দেখবে আসল সব ফাঁকি।
জবর উপায় দিচ্ছি বলে—
নাইবা গেলে সোঁদরবনে,
নিত্যি লোকে বাক্যি তোড়ে
মারছে যে বাঘ ঘরের কোণে।
'নন্দলালের' বংশ মোরা
তাই আছি বেশ দুধে-ভাতে,
বাক্যে যদি বাঘ মারা যায়
শিকারে গিয়ে কি লাভ তাতে?

নৃপতি রহস্য

ধূর্জটি চন্দ

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে বাজারের দিকে। পুব দিকে বাজার। পশ্চিমে খেলার মাঠ। সেদিন বিকেলবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরেই বিল্টু বলল, 'জানিস টুকটুকি, সেই লোকটাকে খেলার মাঠের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে বিল্টু মনে করিয়ে দেয়, 'বুঝলি না, বাজারের মাংসের দোকানের সামনে বিশ্রী চোখে তাকিয়ে থাকা কালো, কুৎসিত মুখের সেই লোকটা।'

আমার মনে পড়ে যায় গত রবিবার আমি আর বিল্টু মাংসের দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে ঐ লোকটাকে দেখেছিলাম। লোকটা বলা হয়তো ঠিক হলো না। অচেনা-অজানা মানুষকে ভদ্রলোকই বলতে হয়। কিন্তু ওর সেই বিশ্রী চাহনি, রক্তবর্ণ চোখ, একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাঁদিকের গালে একটা বিরাট আঁচিল---সব মিলিয়ে মোটেই তাকে ভদ্রলোক বলে মনে হয়নি আমার। কেমন সন্দেহজনক লেগেছিল। বিল্টু অবশ্য বলেছিল ভালভাবে না জেনে কারো সম্বন্ধে মন্তব্য করা উচিত নয়। কিন্তু আমার রহস্যভেদী ফুলমাসীর কাছ থেকে শিখেছি যে কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে ভাল করে দেখে নেওয়াই উচিত। একে নাকি পর্যবেক্ষণ বলে। তাকাতেই ভয় পাচ্ছি, আবার পর্যবেক্ষণ! কোনোরকমে মাংস কিনে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই লোকটা 'এই খোকা, শুনছ' বলে বিল্টুর সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারি সাহস তো! অচেনা অজানা একটা কিম্ভূতকিমাকার লোক কিনা আমাদের পথ জুড়ে দাঁড়ালো! বিল্টুর সাহস বটে। দিব্যি উত্তর দিল, 'বলুন?'

একটা চিঠি বিল্টুর দিকে বাড়িয়ে ধরে লোকটি বলে, 'এটা একটু এই ঠিকানায় পৌঁছে দেবে ভাই?'

বিল্টু কিছু বলার আগেই আমি ধমকে উঠি, 'ও চিঠি পৌঁছে দেবে কেন, ও কি পিওন?'

লোকটা যেন একটু থমকে যায়। আমতা আমতা করে বলে, 'কি করব বলো দিদিমণি, আমি অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও

ঐ ৫৪/১ নীলমণি হালদার লেনের বাড়ি থেকে কারুর কোনো সাড়া পাইনি। তাই চিঠিটা তোমাদের হাতে দিচ্ছি।'

'আমরা যে ওদিকে থাকি, কি করে বুঝলেন?'

'আমি যখন নৃপতি মুখুজ্যের বাড়িতে ডাকাডাকি করছিলুম, তখনই তো তোমাদের পাশের গলি থেকে বেরোতে দেখলুম।'

'চিঠিটা তো এখন আপনিই দিয়ে আসতে পারেন।'

'পারতাম। কিন্তু নটা যে বেজে গেছে।'

'নটা বাজার সঙ্গে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার কি সম্পর্ক?' বিল্টু একেবারে গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন করল।

'ও তুমি বুঝবে না।' বলেই চিঠিটা জোর করে বিল্টুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হনহন করে চলে গেল।

চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার আগে বিল্টু একবার ভেবেছিল পড়ে নেবে। কিন্তু আমি বারণ করি, 'না বিল্টু, পরের চিঠি পড়তে নেই।'

সেই লোকটাকেই নাকি আবার খেলার মাঠের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে বুঝতে পারলাম না। বিল্টুকে বললাম, 'রাস্তায় যখন খুশি যে কেউ হাঁটবে, ঘোরাঘুরি করবে, এতে ভাবনার কি আছে!'

'ঠিক। তবে লোকটার চেহারা যদি সন্দেহজনক হয়, আর সে যদি একটা রহস্যজনক চিঠি দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় অবাক হতে হয়, তাই না টুকটুকি?'

আমি তারিফ করে বলি, 'সত্যি, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার ফুলমাসীর যোগ্য সহকারী হবে দেখছি একদিন।'

'বাজে বকিস না। তুই থাকতে আমি হবো ফুলমাসীর সহকারী!'

নৃপতি মুখার্জীর একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ভদ্রলোক এ পাড়ায় কারো সঙ্গেই মেশেন না। একটা কনটেসা, একটা মারুতি ভ্যান ছিল, কিছুদিন আগে স্টান্ডার্ড-২০০০ কিনেছেন। প্রাসাদের মতো বাড়ি। সামনে বিরাট লন। গেটে সবসময় দারোয়ান থাকে। কেউ বলে গাড়ির ব্যবসা করেন, কেউ বলে শেয়ার মার্কেটের বিরাট হোমরাচোমরা। কেউ বা বলে, একসময় মস্ত জমিদারি ছিল। মোদ্দা কথা, তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা কারো নেই। এ পাড়ায় তিনি মাত্র পাঁচ বছর হলো এসেছেন। বাড়ি হয়েছে তারও আগে। ফুলমাসী একবার বলেছিল, 'ভদ্রলোক আড়ালে থাকতেই ভালবাসেন।'

গরমের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাবো ভাবছি। বিল্টু, আমি, ঝাম্পা, ছোটমামা সবাই বসে প্ল্যান করছি। মা মাঝে এসে একবার শুনিয়ে গেলেন, 'যা বেড়ানোর বেড়িয়ে নাও। সামনের বার মাধ্যমিক। মনে থাকে যেন। শুধু পড়াশুনো তখন।'

ছোটমামা বলল, 'চল, সবাই মিলে গ্যাংটক ঘুরে আসি।'

আমরা সবাই এক পায়ে খাড়া। আর ঠিক তক্ষুণি ফুলমাসী ছুটতে ছুটতে বাড়ি এল।

'শুনেছিস তোরা! নৃপতি মুখুজ্জে খুন হয়েছে। পুলিশ এসেছে। লাশ পরীক্ষা করে মর্গে নিয়ে যাবে হয়তো।'

আমরা সবাই অবাক। সেকি! আমাদের পাড়ায় খুন! বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা লক্ষ্য করলাম। থমথমে ভাব। ফিসফাস চলছে সর্বত্র। কেউ স্পষ্ট কথা বলছে না। যাকেই জিগ্যেস করি, সেই-ই এড়িয়ে যায়। বিল্টু হঠাৎ দ্রুত পা চালিয়ে সামনের গলির দিকে গেল। তাই দেখে আমিও যাব ভাবছি এমন সময় শুনি, 'কি দিদিমণি, ভাল আছ তো? চিনতে পারছ?'

দেখি সেই আঁচিলওয়ালা কালো কিম্ভূত লোকটা দাঁত বার করে হাসছে। আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। একজন মানুষ খুন হয়েছে, আর ও কিনা হাসছে! অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলি, 'আপনিই সেই ভদ্রলোক না, যিনি নৃপতি মুখার্জীকে চিঠি দিয়েছিলেন! তাহলে তো আপনাকে পুলিশের জেরা করা উচিত।'

কথাগুলো বলেই ছুট দিলাম বাড়ির দিকে। পিছন থেকে ভেসে এল লোকটার হা-হা হাসির শব্দ।

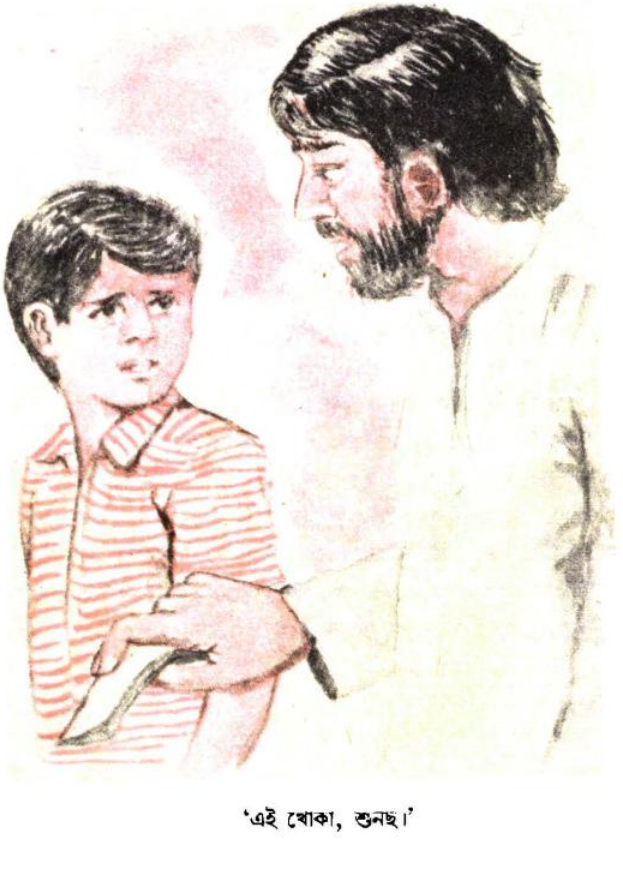

'এই খোকা, শুনছ।'

ছুট দিলাম বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে দেখি ফুলমাসী কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ইশারায় বসতে বলল। তারপর কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রেখে বলল, 'কিরে? হাঁপাচ্ছিস যে? কে তাড়া করল?'

আমি কি ভাবে শুরু করবো জানি না। আদ্যোপান্ত ঐ লোকটা সম্পর্কে সব বলে গেলাম। চিঠি দেওয়া, বিল্টুর সঙ্গে কথোপকথনের যাবতীয় বিবরণ। ফুলমাসী শুনে একটু হাসল। জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁরে, বিল্টু কোথায় গেল?'

আমি বলতে যাচ্ছি, দেখি বিল্টু ঘরে ঢুকল। 'জানিস টুকটুকি, সেই লোকটা আবার এসেছে। তবে মনে হয় লোকটা খারাপ নয়। পুলিশের সঙ্গে কি সব কথা বলছিল যেন।'

'এবার নিশ্চিন্ত তো!'

ফুলমাসীর আশ্বাস বাক্যে আমার লোকটার সম্পর্কে সন্দেহ দূর হলেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে কি ফুলমাসী লোকটাকে চেনে?

আমার মনের কথা ধরতে পেরে ফুলমাসী বলল, 'হ্যাঁ, তুই যা ভাবছিস, তাই। আমি ঐ লোকটাকে জানি। কিন্তু তাতে কি? নৃপতিবাবুকে তো বাঁচানো গেল না।'

'তাহলে ওই লোকটা খারাপ নয়?'

বিল্টুর কথার কোনো উত্তর দিল না ফুলমাসী। শুধু জানাল যে একটু আগে লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল। যেহেতু খুনটা আমাদের পাড়ায়, তাই ফুলমাসীকে বলা হয়েছে পুলিশকে সাহায্য করতে।

এর পরেই ফুলমাসী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'অবশ্য এসব লোকের এমন পরিণতিই হয়।'

আমি বললাম, 'নৃপতিবাবু কি ভাল লোক ছিলেন না?'

বিল্টুও বলে উঠল, 'তাহলে লোকজন যা বলাবলি করছে, তাই সত্যি?'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোক ড্রাগের চোরাকারবারি ছিলেন। তোরা তো জানিস, এই মারাত্মক নেশা যে একবার ধরেছে, তার জীবন একেবারে শেষ হয়ে যায়। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যেও এর চলন শুরু হয়ে গেছে। একটা বিরাট চক্র এদেশে রয়েছে। কলকাতায় নৃপতিবাবু ছিলেন এই চক্রের নাম্বার টু। তাঁর ওপরে আছে নাম্বার ওয়ান। এই নাম্বার ওয়ানই হলো আসল ক্রিমিন্যাল। পালের গোদা। তোদের যে ঐ কুৎসিত লোকটা ন'টা বেজে গেছে বলে চিঠি পৌঁছে দিতে যেতে পারবে না বলেছিল, তার কারণ নাম্বার ওয়ান ভদ্রলোকটি সে সময় নৃপতি মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রতিদিনই আসত। নৃপতিবাবু সারাদিন বাড়িতেই থাকতেন। মাঝে মাঝে কোথাও যেতেন। তাঁর কাজ শুরু হতো রাত্রিবেলায়। বিভিন্ন এজেন্টদের কাছে নিজে গিয়ে হিসেব নিতেন আর সেই হিসেব পরদিন ন'টার সময় নাম্বার ওয়ানকে বুঝিয়ে দিতেন। টাকাপয়সা সম্পত্তি সবই এই পথে করেছেন। ধরা উনি পড়েও ছিলেন। শুধু যথোপযুক্ত প্রমাণের অপেক্ষায় ছিল গোয়েন্দা বিভাগ। আর ঠিক সেই সময় নৃপতিবাবু নিজেই একদিন সাহায্য চেয়ে বসলেন লালবাজারের কাছে। উনি এই চক্র থেকে নিজেকে সরাতে চান, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চান, কিন্তু পারছেন না। গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে তাঁর একটা অলিখিত চুক্তি হয়। যদি তিনি নাম্বার ওয়ানকে ধরিয়ে দিতে পারেন ও সময় সময় সবরকম ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে তাঁর অপরাধের দরুন কম শাস্তির কথা সরকার চিন্তা করবে। সেভাবেই চলছিল সব।'

'বাব্বাঃ, তুমি এত জানো! অথচ কখনো আমাদের বলোনি তো?' অনুযোগ করে বিল্টু।

উত্তরে ফুলমাসী হাসল।

এমনি সময় গলির দিকের জানলা দিয়ে একটা কাগজের মোড়ক মেঝেতে এসে পড়ল। আমি সেটা কুড়িয়ে এনে খুলতেই দেখি দু-লাইনের একটা ছড়া লেখা আছে। ফুলমাসী হাত থেকে

কাগজটা নিয়ে বিড়বিড় করে ছড়াটা আওড়লো: রাম গেছে বনে/কে আর মাংস কেনে।

ফুলমাসীকে চিন্তা করতে দেখে আমরা আস্তে আস্তে সরে পড়লাম। বিল্টু বলল, 'টুকটুকি, আয় আমরাও ভাবি।'

'আমি আবার কি ভাববো? তুই ভাব।'

'শুনলি না, ফুলমাসী ছড়াটা নিয়ে বিড়বিড় করছিল।'

'তা তো শুনেছি। কিন্তু রাম বনে যাওয়ার সঙ্গে মাংস কেনার সম্পর্কটা কি?'

'দাঁড়া তো, এক মিনিট আমি আসছি।'

বলেই বিল্টু বেরিয়ে পড়ল। নৃপতিবাবু খুন হয়েছে কখন জানা যায়নি। তবে সকাল আটটায় আমরা খবরটা জেনেছি। তারপর তো ঘণ্টা আড়াই কেটে গেছে। এরই মধ্যে কি ছাই চিন্তা করবো, বিল্টুটা যে কি?

ফুলমাসী এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে বেরোনোর জন্য। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেল যেন বাড়ি থেকে না বেরোই। বিল্টু এলে দুজনে মিলে যেন ফোনের কাছাকাছি থাকি। কোনো খবর-টবর থাকলে যেন লিখে রাখি। দেখলাম, ফুলমাসী ড্রয়ার থেকে নিল একটা অটোমেটিক রিভলবার, অনন্তকাকুর হত্যাকাণ্ডের কিনারা করে তপনমামার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল। আমাদের তপনমামা ফুলমাসীর তপনদা, স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন বড় অফিসার।

ফুলমাসী তো বেরিয়ে গেল, আমি কি করি! বিল্টুরও পাত্তা নেই। গলির দিকের জানলা বন্ধ করে দেব ভাবছি, আর তখনই সেই লোকটাকে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি একটা বই নিয়ে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছি। লোকটাকে এখন আর তেমন খারাপ ভাবছি না। কারণ, বিল্টু বা ফুলমাসী কেউই ওর সম্পর্কে সন্দেহজনক কিছু বলেনি। বিশেষ করে বিল্টু যখন ওকে দেখেছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে না ভাবতেই হন্তদন্ত হয়ে বিল্টু এলো।

'ফুলমাসী, ফুলমাসী.....'

'ফুলমাসী বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তোমাকে বলেছে বাড়িতে থেকে টেলিফোনে কোনো মেসেজ থাকলে নোট করতে।'

বিল্টু ধপাস করে বসে পড়ে জানায়, 'জানিস, মাংসের দোকানটা বন্ধ। আজ সকাল থেকেই।'

'তো কি হলো? মানুষের শরীর খারাপও তো হতে পারে।'

'তা পারে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে কোথাও একটা রহস্য রয়ে গেছে—নৃপতিবাবু খুন, মাংসের দোকান বন্ধ, জানলা দিয়ে কাগজের মোড়কের প্রবেশ, তাতে দু-লাইনের ছড়া.....'

ওর চিন্তিত মুখ দেখে আমি বলি, 'নাহ্, সত্যিই তুই গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিস।'

'কি হয়ে উঠেছি জানি না। তবে ঐ ছড়াটার মানে যে উদ্ধার

ড্রয়ার থেকে নিল একটা রিভলবার।

করতে পেরেছি, বুঝতে পারছি।'

'তাহলে তো যে কাগজটা অযাচিতভাবে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল, সে ফুলমাসী আর আমাদের বিল্টুবাবুর হিতৈষী!'

'ঠিক বলেছিস টুকটুকি। এই তো তোর বুদ্ধি খুলে গেছে।'

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিল্টুই ধরল, 'হ্যালো... না, উনি নেই। বেরিয়েছেন। আমি ওঁর বোনপো বলছি...হ্যাঁ ....হ্যাঁ....ঠিক আছে, বলে দেব... কি বললেন? দাঁড়ান, লিখে নিচ্ছি। রা-জা-আ-ছে-ন বেঁ-চে দা-শ-র-থি সে-জে। ঠিক আছে....হ্যালো, হ্যালো, আপনি কে বলছেন? যাচ্চলে? রেখে দিয়েছে।'

এর পর দিন সাতেক হয়ে গিয়েছে। ফুলমাসীকে ঐ টেলিফোনের মেসেজটার মানে জিগ্যেস করেও সদুত্তর পাইনি। বলা যায়, খুবই চিন্তিত লাগছিল এ কয়দিন। আমাদের সঙ্গে সেভাবে কথাও বলছিল না। কখন বাইরে যেত, কখন বাড়ি আসতো, আমরা

টের পেতাম না। শুধু রাত্রিবেলা একবার সামনাসামনি দেখা হতো। কিন্তু কথা বলার সাহস পেতাম না। বিল্টু শুধু একবার আমার কানে কানে বলেছিল, 'জানিস, মনে হয় নৃপতি হত্যাকাণ্ডের কিনারা হয়ে গিয়েছে। তাই ফুলমাসী এত চুপচাপ।'

আমারও অনেকটা সেই রকম ধারণা। এর আগেও দেখেছি রহস্যের জট খুলবার আগের মুহূর্তে ফুলমাসী কেমন চুপ হয়ে যায়। একা একা কথা বলে। আপনমনে। তখন জিগ্যেস করেও কোনো কথার জবাব পাওয়া যায় না।

যাই হোক, আজ সকালে ফুলমাসী আমাকে ডেকে বলল, 'বিকেলে তোমাদের তপনমামা আসবেন। তোমরা সবাই বাড়ি থেকো।'

আমি বললাম, 'ফুলমাসী, তাহলে কি নৃপতি রহস্যের সমাধান—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফুলমাসী বললে, 'শুধু এইটুকু জেনে রাখ নৃপতি মুখুজ্জে খুন হননি, খুন হয়েছে অন্য কেউ। বাকিটা বিকালে।'

ব্যস। আমরা জানি আর শত জিগ্যেস করেও উত্তর পাওয়া যাবে না।

বিকালের অপেক্ষায় আমি আর বিল্টু বসে রইলাম। তবে হ্যাঁ, বিল্টুকেও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। দু-লাইনের ছড়ার মানে ও সঠিক উদ্ধার করেছিল। 'রাম গেছে বনে, কে আর মাংস কেনে।' মাংসের দোকানের মালিক রামলাল সেদিন থেকে উধাও। দোকানও বন্ধ।

বিকেল হতেই আমরা সব তৈরি। গুনগুন করে গান গাইছে ফুলমাসীও। মাঝে একবার টেলিফোন এ্যাটেন্ড করে আমাদের খুশির খবরটা দিল ফুলমাসী। কমিশনার সাহেব ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফুলমাসীকে পুলিশকে যথাসময়ে সাহায্য করার জন্য। এমন সময় বিল্টুর গলা শোনা গেল, 'এ কি! কোথায় ঢুকছেন আপনি, কাকে চান?'

'আ মোলো! ভাগনে হয়ে মামাকে চিনতে পারো না!'

আমি ছুটে এসে দেখি সেই বিশ্রী লোকটা, বলছে সে নাকি আমাদের মামা। আমি চিৎকার করে ফুলমাসীকে ডাকতেই হাসতে হাসতে লোকটা তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও আঁচিলটা তুলে ফেলল। তারপর কারো অপেক্ষায় না থেকে সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়ল। আর ফুলমাসী আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে দিব্যি হাসতে লাগল।

মা সবাইকে বিকালের জলখাবার দিয়ে গেলেন। গরম গরম লুচি আর আলুর ছক্কা। সঙ্গে মিষ্টি। আমরা তাকিয়ে আছি ফুলমাসীর দিকে। তপনমামা শুরু করলেন, 'তারপর, ফুলু, তুমি নিশ্চয় আমায় এ ব্যাপারে ধন্যবাদ দেবে যে ঠিক সময়ে আমি নকল নৃপতিকে ধরতে পেরেছিলাম।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। সেজন্যই তো তুমি মাংসের দোকানের ওপর নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে। কিন্তু বেচারী রামলাল, ও একবারও ভাবেনি যে ওর জারিজুরি সব তুমি ধরে ফেলেছ।'

বিল্টু ফুট কাটে, 'তাহলে ঐ মাংসের দোকানদারই খুনী?'

ফুলমাসীর পালটা প্রশ্ন, 'কার?'

'কেন, নৃপতি মুখার্জীর।'

'যে লোকটা খুনই হলো না তার আবার খুনী কি! খুন হয়েছে মাংস-দোকানের আসল মালিক রামলাল, দোকানে যাকে আমরা কখনো বসতেই দেখিনি। যাঁকে দেখতাম তিনি নৃপতি মুখার্জী। রামলাল সেজে তিনিই দিনের বেলায় দোকান চালাতেন। আমরা নৃপতি মুখার্জীকেও চাক্ষুষ কোনোদিন দেখিনি। তাই আসল নকল ধরতে এত দেরি হলো। মনে আছে তোমাদের সেই টেলিফোনের মেসেজটার কথা? রাজা আছে বেঁচে। দাশরথি সেজে?'

বিল্টু বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে, আমিই তো ধরেছিলাম ফোনটা।'

'দাশরথি মানে কি? দশরথের পুত্রকে এককথায় দাশরথি বলে। এক্ষেত্রে দাশরথি হচ্ছে রাম, মানে মাংসের দোকানের রামলাল। রাজা অর্থে নৃপতি মুখার্জী বেঁচে আছেন রামলালরূপে। এই সহজ ব্যাখ্যাটাই এই রহস্যের মোড় ঘুরিয়েছে। এর জন্য অবশ্য আমি তপনদার কাছে ঋণী। তোমরা তো জানো তপনদা বরাবর মাংসের দোকানের দিকে লক্ষ্য রাখতো। তাছাড়া—'

'ওহ! এবার বুঝেছি, বারে বারে তপনমামার বিশ্রী ছদ্মবেশের কথা তোমাকে বললেও তুমি গা করতে না। তখনই বুঝেছিলাম যে আমরা যাই ভাবি না কেন, তোমার কাছে লোকটি সন্দেহজনক নয়।'

'রাইট বিল্টু।'

তপনমামা ও ফুলমাসী দুজনের কাছ থেকে জানলাম পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আসল নৃপতি মুখার্জী চেয়েছিল অন্য নামে স্বভাবিক জীবন কাটাতে। প্ল্যানটা কষেছিল ভারি সুন্দর। ওদেরই এক টাউটকে সে এ ব্যাপারে কাজে লাগাল। সে হচ্ছে রামলাল। রামলালের সঙ্গে নৃপতি মুখার্জীর চেহারার এবং ভাবভঙ্গির অদ্ভুত একটা মিল ছিল। তফাৎ একটু শুধু মুখে। তা সেটুকু তো সহজেই দূর করা যায় আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি মুখোশ দিয়ে। সেই রাস্তাই ধরল নৃপতি। অর্থের লোভ বড় লোভ। গাড়ি চড়ে ভালমন্দ খেয়ে সুখস্বপ্ন দেখতে কে না চায়! কিন্তু রামলাল স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই ছদ্মবেশ নেওয়ার জন্য তাকে জীবন দিতে হবে। যে নৃপতি মুখার্জী পুলিশের কাছে নিজের ভাল হওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করে পালের গোদাটিকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে হচ্ছে এই রামলাল। আসল নৃপতি তখন মাংসের দোকানে। গোঁফদাড়ি রেখে সেও নিজের আসল চেহারা কতকটা আড়াল করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মাংসের দোকানটি এ পাড়ায়

নতুন। মাস ছয়েকের। তবে নৃপতি আর রামলালদের দলের নাম্বার ওয়ান ব্যাপারটা একদিন ধরে ফেলে। ঈগলের চোখ নিয়ে ওরা ঘোরাফেরা করে। কাজেই ওদের মতো শয়তানকে নৃপতি ফাঁকি দিতে পারেনি। প্রতিহিংসা নিতে ওদের জুড়ি নেই। খুন জখম করাও ওদের কাছে কোনো কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া পুলিশের কাছেও নৃপতি মুখার্জীর ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে ঠেকেছিল। তপনমামা সেজন্যই মাংসের দোকান ও নৃপতি মুখার্জীর বাড়ি দুদিকেই নজর রাখছিল। নৃপতি এইবার পড়ে গেল উভয় সঙ্কটে। একদিকে নাম্বার ওয়ান আর একদিকে পুলিশ। বেপরোয়া নৃপতি তখন সম্ভবত চেষ্টা করেছিল কোনোক্রমে বেনামী-টেনামী করে বিষয়সম্পত্তি সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু সেটাও তো খুব সহজ আর চট্‌পট সেরে ফেলার কাজ নয়। তাছাড়া নকল নৃপতিই বা এক কথায় সব ছেড়ে দেবে কেন? এই রকম একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত একজনকে সরে যেতেই হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মারা গেছে নকল নৃপতি অর্থাৎ রামলাল আর আসল নৃপতি পালিয়েছে। কারণ নকল নৃপতিকে সে-ই খুন করিয়েছিল। কিন্তু নকল নৃপতির দুধের সঙ্গে বিষ কে মিশিয়েছিল আর সেই রহস্যজনক ফোনকলটা কার কাছ থেকে এসেছিল সে হদিস পুলিশ এখনো পায়নি। তা গুণ্ডা-বদমায়েশরা এইভাবে নিজেদের জালে জড়িয়েই মরে। পুলিশের আসল টার্গেট ছিল সেই নাম্বার ওয়ান। সেটা এবারেও ফসকালো। নতুন কোনো ক্লু না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই এই কেসের ইতি।

আমি ও বিল্টু একসঙ্গে বলে উঠি, 'কিন্তু মামা, ঐ চিঠিটাতে কি ছিল বললে না তো?'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ চিঠিটার জন্যেই তো রামলালকে এত তাড়াতাড়ি মরতে হলো। চিঠিটায় লেখা ছিল, 'নৃপতিবাবু, সাবধানে থাকবেন। আপনার জীবন বিপন্ন।' রামলাল ভুল করেছিল এখানেই। সে সরল মনে চিঠিটা নৃপতি মুখার্জীর হাতে তুলে দিয়েছিল। কারণ, নৃপতিবাবু চিঠিটা পেয়ে বুঝলেন তাঁর আশঙ্কাই সত্যি। চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে। তাই আর দেরি না করে তিনি রামলাল নিধনের পরিকল্পনা করে ফেলেন।'

'এ ব্যাপারে তবে মামাও দায়ী। তুমি তো রামলালের জীবনই বাঁচাতে চেয়েছিলে। তাহলে?'

'ঠিকই বলেছ। তবে যদি রামলালকে রামলাল বলেই লিখতাম, তাহলেও বিপদ হতো। কেননা সেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ বুঝে যেত নকল নৃপতির আসল পরিচয় টের পেয়ে গেছি।'

'অগত্যা নকল নৃপতিকে মরতে হলো। আর গোটা দলটাকে যে ছেঁকে তোলা যাবে ভেবেছিলাম, সেটাও বানচাল হলো।' ফুলমাসী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল।

আমরাও আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম, হাঁটা দিলাম যে যার পড়ার ঘরের দিকে।

আপনি কি হারাচ্ছেন জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

যত্ত দোষ ঐ রিয়ার

সুস্মিতা বিশ্বাস

যত্ত দোষ ঐ রিয়ার। কি দরকার ছিল তোর শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে হারিয়ে যাবার? নন্দা আন্টি না হয় তোকে কোল থেকে একটু নামিয়ে দোকানের শোকেসে রাখা ফ্রকগুলো দেখেশুনে পছন্দ করছিলেন, আর ওরই মধ্যে তুই হাওয়া! কি আক্কেল বলো দেখি মেয়ের? নন্দা আন্টির সে কি অবস্থা! কাঁদতে কাঁদতে যখন ফ্ল্যাটে ফিরে খবর দিলেন তখন সমস্ত বাড়িটাতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল না? বান্টি, লিসা, বনি—সব্বার বাবারা আর চঞ্চলকাকু যখন রিকা আর রিয়ার বাবা তড়িৎকাকুর সঙ্গে রিয়াকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন তখন বড়দের সঙ্গে ওরাও কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অবশেষে রাত্রি ন'টার সময় রিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। থানাতেই পাওয়া গিয়েছিল রিয়াকে। আচ্ছা মেয়ে যা হোক! নন্দা আন্টি এদিকে তিনবার মূর্ছা গেলেন আর ওদিকে রিয়া নাকি দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছিল থানার সবার সঙ্গে। চঞ্চলকাকুরা গিয়ে দেখে রিয়া থানার ও. সি-র টেবিলে বসে তাঁর মস্ত ভুঁড়ির ওপর দুটো পা তুলে গালে হাত দিয়ে পাকা বুড়ির মতো গল্প করছে। তার আগে নাকি ও ওনাদের নাচ দেখিয়েছে, গান শুনিয়েছে, ছড়া শুনিয়েছে—খালি বাবার নাম আর কোথায় থাকে সেটা কিছুতেই বলছিল না। অনেক কষ্টে ভুলিয়ে ভালিয়ে জানতে পেরেই ওনারা খবর দিয়েছিলেন। তাই এত দেরি।

সে থাক। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু ঝামেলাটা হলো রিকা, বান্টি, লিসা আর বনির। সারাটা সপ্তাহ তো তাদের স্কুল আর বাড়ি করতেই কেটে যায়। সপ্তাহে শনি আর রবি এ দুটোই ছুটির দিন। কিন্তু কোথাও বের হবার যো আছে? সন্ধ্যা থেকে মায়েরা সব টি.ভি খুলে বসে পড়লেন, ব্যস।

ইদানিং রুটিনটা তাদের প্রায়ই পাল্টে যাচ্ছিল। পুজো আসছে। প্রায় দিনই হয় নন্দা আন্টি না হয় তুলিকা আন্টি, কিংবা বুল্টি আন্টি অথবা সোনালী আন্টি কারুর না কারুর কিছু কেনাকাটার দরকার পড়ে যায়। আর তাই প্রায় দিনই বিকেলবেলা বাবারা অফিস থেকে ফিরলে তাঁদের চা জলখাবার দিয়ে মায়েরা সব সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েন। যদিও বাচ্চাদের নিয়ে বের হতে সবারই আপত্তি, তবুও কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে ওরা পাঁচজনই সঙ্গ ধরত। নিমরাজী মায়েরা এক্কেবারে বেঁকে বসলেন ঐ রিয়ার হারিয়ে যাবার দিন থেকে। 'কক্ষণো না, কিছুতেই তোমাদের নিয়ে মার্কেটিং-এ যাব না, ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যাবে। ছোটদের নিয়ে মার্কেটিং-এ যাওয়া চলে না। দেখলে না রিয়া কেমন হারিয়ে গিয়েছিল।' সোনালী আন্টি গম্ভীর মুখে বাচ্চাদের রায় শুনিয়ে দিলেন।

বান্টি সবার বড় ওদের মধ্যে। তার উপর সোনালী আন্টি ওর মা হন সে-ই কচুমচু মুখ করে শেষ অবধি বলেই ফেলল,

'কোথায় রিয়া হারিয়ে গিয়েছিল? ও তো থানার ও.সি. কাকুর সঙ্গে গল্প করছিল। আর শুধু কি ছোটরাই হারায়, বড়রা হারায় না বুঝি?' বলেই আড় চোখে বনির দিকে চাইল।

বনি রেডি হয়েই ছিল। 'তাই-ই তো। এই তো চৈত্রের সেলের সময় এই বছরেই গড়িয়াহাটে আমার মা-বাবা হারিয়ে গিয়েছিল।' সোনালী আন্টি হাসি চেপে তুলিকা আন্টির দিকে তাকালো। বনি বলেই চলেছে—

'সেদিন ভীষণ ভিড় ছিল। আমার ভারী ভয় হচ্ছিল যদি আমি হারিয়ে যাই। তাই শক্ত করে বাবার হাত ধরেছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা লোক কি সুন্দর কতগুলো খেলার কুকুর বিক্রি করছে। আমি বাবার হাতটা ছেড়ে কুকুরগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি বাবা নেই, মাও নেই। কি ব্যাপার? এদিক ওদিক খুঁজছি...নেই, উঁহু নেই'—গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে বনি। ঘটনাটা সবার জানা, তবু নন্দা আন্টি, বুল্টি আন্টি মজা করে শোনে বনির বক্তব্য—'বুঝলাম, যা হবার হয়ে গেছে—মা-বাবা দুজনেই হারিয়ে গেছে।'

একটা চাপা হাসি শোনা গেল মায়েদের মুখ থেকে। ফর্সা তুলিকা আন্টি একটু লালচে হয়ে ধমকে উঠলেন বনিকে, 'থাম, পাকাটে ছেলে।'

সোনালী আন্টি বললেন, 'আহা দাঁড়া না, শুনতে দে তোরা কেমন হারিয়ে গিয়েছিলিস।' সোনালী আন্টির চোখে মুখে হাসি, বনির দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, তারপর?'

বনি একটু থমকে গিয়েছিল, আবার শুরু করল, 'আমি তো

অবাক! কোথায় বাবা-মা? সব সময় আমাকে বলে, সাবধান বনি, হারিয়ে যাবে, আর নিজেরাই হারিয়ে গেল? তারপর আধ ঘণ্টা, বুঝলে সোনালী আন্টি পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে গড়িয়াহাটে আমি বাবা আর মাকে খুঁজলাম—' বনি একটু থামল।

সত্যি, ও একদম হিরণকাকুর মতো করে কথা বলে। চঞ্চলকাকু ঐ জন্যই বলেন, 'বাপকা বেটা।'

'শেষে কি করি? হঠাৎ দেখি একজন পুলিশকাকু। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে বললাম, পুলিশকাকু আমার মা আর বাবা হারিয়ে গেছে? তুমি লালবাজারে একটা খবর দেবে? পুলিশকাকু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, কে হারিয়ে গেছে? তুমি না তোমার বাবা-মা? আমি তো শুনে অবাক! বলেন কি পুলিশকাকু! এই দিব্যি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি হারাতে যাব কোন দুঃখে? বাবা-মা-ই তো হারিয়ে গেছে। একটা কিছু বলতে যাচ্ছি হঠাৎ শুনি বাবার গলা, ঐ তো বনি। তাকিয়ে দেখি বাবা আর মা। বাবা রেগে আমাকে ধমকে উঠলেন, এই তো দুষ্টু ছেলে, হাত ছাড়িয়ে কোথায় গিয়েছিলি? পুলিশকাকু বাবাকে থামিয়ে বললেন, থাক, আর বকতে হবে না। বাচ্চা নিয়ে এই ভিড়ে একটু সাবধানে থাকবেন তো। আরেকটু হলেই তো হারিয়ে যেতেন। আপনাদের ছেলে মিসিং স্কোয়াডে আপনাদের নাম লেখাতে চাইছিল। আশেপাশে সবাই হাসতে আরম্ভ করল।'

লিসা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন রে?'

'কে জানে, বোধ হয় মা কাঁদছিল বলে।' গম্ভীর মুখে ঘটনাটা শেষ করে বনি।

রিকা অবাক হলো, 'তুলিকা আন্টি কাঁদছিল? সত্যি?'

লিসা বলে, 'কাঁদবে না? হারিয়ে গেলে সবাই কাঁদে।'

রিয়া এতক্ষণ নন্দা আন্টির কোলে বসে তাঁর হারের লকেটটা চিবোচ্ছিল, এখন তাড়াতাড়ি হাত ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'আমি তাঁদিনি আমি তাঁদিনি।' সবাই হেসে ফেলল রিয়ার কথা শুনে। নন্দা আন্টিও।

কিন্তু ছোটদের যুক্তি বড়দের দরবারে কোনো দিন টিঁকেছে কি? তা সে যতই অকাট্য হোক? সেদিনও টেঁকেনি। সোনালী আন্টি সব শুনেটুনেও বিশ্রী রকম রায় দিলেন, 'অতএব বোঝা যাচ্ছে চৈত্রের সেলে বড়রা হারিয়ে যায় আর পুজোর কেনাকাটার সময় ছোটরা। সুতরাং এই সময় বাচ্চারা কোনোমতেই মার্কেটিং-এ বের হতে পারে না। একেকদিন তোমাদের সবাইকে একেক আন্টির কাছে রেখে বাদবাকিরা বেরোবেন, বুঝলে?'

আর বোঝাবুঝি! যত্ত দোষ সব ঐ রিয়ার।

হ্যাঁ, আজ হলো সেই শনিবার যেদিন প্রথম ছোটোদের রেখে মায়েরা মার্কেটিং-এ গেছেন। বুল্টি আন্টির কাছে ওরা রয়েছে। যতটা বাজে কাটবে ভেবেছিল সময়টা ততটা বাজে কাটেনি। সারা দুপুরে বুল্টি আন্টি তিনটে গল্প শুনিয়েছেন, রিয়া রিকা আর লিসার নাচ দেখেছেন, বনি আর বাল্টির হি ম্যান-হি ম্যান খেলা দেখেছেন। এখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। মায়েরা এক্ষুণি এল বলে। চঞ্চলকাকুরও অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়ে গেছে। ওদের চুপটি করে বসে থাকতে বলে বুল্টি আন্টি রান্নাঘরে গেছেন। পাঁপড় ভাজা আর ডিমের বড়া হচ্ছে ওদের সবার জন্য। রিয়া শুধু দুধ খাবে।

বুল্টি আন্টির ফ্ল্যাটটাই সবচাইতে সাজান আর সুন্দর। আগে এটাই সবচাইতে বিচ্ছিরি ছিল। তখন চঞ্চলকাকু একা থাকতেন। তারপর বুল্টি আন্টি এলেন। ওঃ চঞ্চলকাকুর বিয়েতে ওরা কত্ত আইসক্রীম খেয়েছিল। রিয়ার তখন জন্মই হয়নি। ওদের পাঁচজনের চেষ্টায় ফ্ল্যাটটা মোটামুটি অগোছালো হয়ে উঠেছে। বনি আর লিসা বিছানায় ডিগবাজি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাল্টি ঝোলান পর্দায় বার কতক টারজান সুইং করেছে। রিয়া আর রিকা ড্রেসিং টেবিল নিয়ে ব্যস্ত। রিয়া মাটিতে থেবড়ে বসে পুতুলটাকে বেশ করে পাউডার মাখাচ্ছে আর রিকা লিপস্টিকটাকে মনের আনন্দে ঠোঁটে ঘষছে। বনির হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিকে। বিছানা ছেড়ে নেমে এসে রিকার হাত থেকে লিপস্টিকটা টেনে নিয়ে আয়নাটাকে ব্ল্যাকবোর্ড বানিয়ে মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগল টু-টু জা ফোর, টু-থ্রী জা সিক্স, টু ফোর...

ওকি! চমকে যায় বনি। আয়নার ভেতর দিয়ে জিনিসটাকে প্রথম দেখল ও। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। এ ঘরটাতে ওরা এই মাত্র ঢুকেছে বলে খাটের তলাটায় এখনও ঢোকা হয়ে ওঠেনি। সেই খাটের তলাতেই কি অদ্ভুত একটা জীব নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় ওরা সবাই। সত্যিই তো, অন্ধকার অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিক। ঘরের ভেতরটাও বেশ অন্ধকার আর খাটের তলাতে তো আর কথাই নেই। বুল্টি আন্টিও ধারে কাছে নেই। ওদিকে ওটা ক্রমেই নড়ছে চড়ছে। সব্বাই গোল-গোল

আঙুল দিয়ে দেখানমাত্র.....

চোখ করে হুমড়ি খেয়ে দেখছে, একমাত্র রিয়া ছাড়া। ও এখন সেন্টের শিশিটাকে দুধের বোতল করে পুতুলটার মুখে ঠেসে দিচ্ছে আর গম্ভীর মুখে মাঝে মাঝে বলছে, 'দুদু খা, দুদু খা। ছোনা মেয়ে দুদু খাও, পুতুল দেব খাও।' ওদিকে চোঙের মতো জীবটা এবার এদিকে বেরিয়ে আসছে। গা ছমছম করে ওঠে ওদের। কি ওটা? বনি এমনিতে খুবই সাহসী ছেলে, কিন্তু বুল্টি আন্টি আজ যা সব গল্প বলেছেন না, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। কঙ্কাটার গল্পটা কেবলই মনে পড়ছে। এমন সময় কানের কাছে বান্টি বলে উঠল, 'কঙ্কাটাটা নয় তো?' অমনি আতঙ্কে একটা বিচ্ছিরি রকম চিৎকার করে উঠল চারজনে। মুহূর্তের মধ্যে একটা তালগোল পাকিয়ে সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরল। বেচারী রিয়া তার দাদা দিদিদের এই রকম বেমক্কা চিৎকারে আঁতকে উঠে ভয়ঙ্কর রকম ফুঁপিয়ে উঠল। লিসা একনাগাড়ে ইঁ-ইঁ করে কাঁদতে লাগল দুচোখ যতটা শক্ত করে বন্ধ করা সম্ভব তা করে। বান্টির মুখ দিয়ে একটানা একটা বু-বু-বু আওয়াজ বেরোচ্ছে। মুখটা রিকার পিঠে গোঁজা। রিকা ঠকঠক করে কাঁপছে। আর বনি ওটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দুহাতে লিসা আর বান্টিকে চেপে ধরেছে। ঘাড়টা শক্ত, হঠাৎ যদি ঘুরে যায় আর ঐ আজব জীবটাকে আবার দেখতে হয়!

ওদিকে ওদের চেঁচামেচিটা রান্নাঘর অবধি পৌঁছে গেছিল, আর বুল্টি আন্টি 'কি হলো কি হলো' বলে শোরগোল করে ছুটে আসতে গিয়ে বান্টির মোটরগাড়িতে পা দিয়ে ফেলে একেবারে সড়াৎ ধরাম। ঠিক এই সময় চঞ্চলকাকু অফিস থেকে ফিরলেন। বাড়িতে ঢুকেই চোখের সামনে বুল্টি আন্টিকে পড়ে যেতে দেখে থতমত খেয়ে কিছু বলার আগেই বুল্টি আন্টি উঠে পড়লেন। ওদিকে গোলমালটা চঞ্চলকাকুরও কানে গেছিল। তাড়াতাড়ি এ ঘরে এসে লাইট জ্বালিয়ে কাণ্ড দেখে তো অবাক। বেচারী রিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুল্টি আন্টির হাঁটু জড়িয়ে ধরল। বুল্টি আন্টির কোমরে খুবই লেগেছিল তা সত্ত্বেও ওকে কোলে নিলেন, আর বাদবাকি সব কটা চঞ্চলকাকুকে জড়িয়ে ধরে একযোগে 'কঙ্কাটা, কঙ্কাটা' বলে চেঁচাতে লাগল। চঞ্চলকাকু অসম্ভব রকম অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায়?' ওরা পেছন না ফিরে এক সঙ্গে আঙুল দিয়ে খাটের দিকটা দেখান মাত্র চঞ্চলকাকুর হা-হা হাসিতে ঘর ভরে গেল। বুল্টি আন্টিও হেসে ফেললেন। চঞ্চলকাকু বললেন, 'এই বোকাগুলো, ওটা কঙ্কাটা হতে যাবে কেন, ওটা তো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট।'

'না না, ওটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল।'

'আসবেই তো, দেখ না ওটার তলায় কি আছে।' ওদের জড়িয়ে চঞ্চলকাকু ওটার দিকে এগিয়ে যান। ওরা সবাই ভয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুল্টি আন্টির দিকে সরে আসে। রিয়া অবধি কখন চুপ করে গেছে। চঞ্চলকাকু ওটার কাছে গিয়ে ঝুড়িটাকে একটানে তুলে ফেলতেই ওমা! কি সুন্দর ঝুমরো ঝুমরো লোমওয়ালা একটা এত্তটুকুন কুকুরছানা। এবার অবাক হবার পালা বান্টিদের।

'দেখেছিস তোদের কঙ্কাটা কে?' চঞ্চলকাকু ওটাকে কোলে তুলে আদর করতে করতে বললেন, 'কালই এনেছি এটাকে, সুন্দর না? এটাই বাস্কেটের তলায় ছিল। তোদের সাড়া পেয়ে তোদের সঙ্গে খেলবে বলে বেচারা ঝুড়িটাকে ঠেলে এতখানি চলে এল, আর তোরা ওকে দেখে ভয় পেলি? ছি-ছি, কি মনে করল বলত বাচ্চাটা।'

লিসা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'খুব যে ছি-ছি করছ, ওকে দেখে ভয় পাব কেন? ঝুড়িটাকে ভয় পেয়েছি... না মানে নড়ছিল বলে।' আরও গণ্ডগোল হতে যাচ্ছিল লিসার বক্তব্যে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

বনি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তা ওটাকে ঝুড়ি চাপা দিয়েছিলে কেন শুনি? আমাদের ভয় দেখাতে?'

চঞ্চলকাকু কুকুরছানাটাকে মাটিতে নামিয়ে বনির দিকে এগিয়ে এলেন। ওর ঝাঁকড়া চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না বনিবাবু, ওরকম কোনো ইচ্ছেই আমাদের ছিল না। আসলে তোদের বুল্টি আন্টি আমাকে সকালেই বলেছিল, দস্যিগুলো আসার আগেই এটাকে খাইয়ে দাইয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট চাপা দিয়ে বেডরুমে খাটের তলায় রেখে দেব। তাই করেছিল। তোরা বোধহয় আগে অন্য ঘরে ছিলি, তাই এই ঘরে ও চুপচাপ ঘুমোচ্ছিল। তোদের হৈচৈ-এ ও উঠে পড়েছিল আর খেলতে চাইছিল। আফটার অল ছেলেমানুষ কিনা!'

সবাই কেমন চুপসে যায়। সত্যিই তো বোকার মতো কেমন ভীতু হয়ে গেছিল ওরা। মুখে আর কথা সরে না কারুর। ওরই মধ্যে একটু গলা ঝেড়ে বান্টি বলে, 'আমরা কি দস্যি?'

চঞ্চলকাকু দ্রুত কোঁচকান বিছানার চাদর, মেঝেতে পড়ে থাকা বালিশ, ঝুলে যাওয়া পর্দার স্প্রীং এবং শেষমেষ ড্রেসিং টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, 'অবশ্যই না, কক্ষণো না, কিছুতেই তোমাদের দস্যি বলা চলে না। বুল্টি 'দস্যি' ওয়ার্ডটা উইথড্র করে শীগগির নিয়ে এস যা ভেজেছ। দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। আমরা সবাই মিলে খাব, তারপর বাচ্চাদের একটা সিনেমার ক্যাসেট এনেছি, দেখব।'

সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'এক্ষুণি চালাও কাকু, এক্ষুণি চালাও।'

বুল্টি আন্টি রিয়াকে কোলে করে চলে গেলেন। মিনিট দশেক বাদে যখন ডিমের বড়া আর পাঁপড় ভাজা নিয়ে ঢুকলেন তখন ভিডিওতে একটা দুষ্টু বেড়ালছানার কীর্তিকলাপের সিনেমা চলছে। বুল্টি আন্টির কুকুরছানাটার অবধি চোখের পলক পড়ছে না।

ডিমের বড়া শেষ হতে হতেই হৈহৈ করে মায়েরা ফিরে এলেন। কি মজা! একগাদা জামা-কাপড়ের সঙ্গে ওদের জন্য এসেছে টফি, বেলুন, চানাচুর, আরও কত কি। যাক, সবটা মিলিয়ে দিনটা খারাপ কাটেনি একেবারে।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

সময় কিরকম কেটে যায় দেখছো তো? এই তো সেদিন শিউলি গাছে ফুল ফুটছিলো, আকাশের নীল রং মেখে শরৎ খুশির হাসি হাসছিলো। আর এখন, হাওয়া ঘুরতে শুরু করেছে উত্তর দিকে। হঠাৎ একদিন দেখবে শীতের হাওয়া গাছের ডালে ডালে দোলা লাগাবে। সত্যি প্রকৃতির নিয়মে এতোটুকুও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। যেটুকু এদিক ওদিক হচ্ছে তার জন্যেও কিন্তু দায়ী আমরাই। নানাভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে আমরা আমাদের সুজলা, সুফলা গ্রহকে দিন দিন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছি। অনেক সময় আমরা কিন্তু আমাদের অন্যায়টা টেরও পাই না।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা নানাভাবে দেদার কাগজ নষ্ট করি। লেখাপড়ার জন্যে কাগজ তো লাগবেই। সেটা কোনো কথা নয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমরা কাগজ বাঁচাতে পারি। কাগজ তৈরি করতে গাছ কাটতে হয় জানো তো। এক টন কাগজ তৈরি করতে ২.২ টন কাঠ লাগে। তার মানে এক টন কাগজের জন্যে কতোগুলো গাছ কাটতে হয়! ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো কোনোদিন। তাছাড়া শুধু কাঠ হলেই তো হবে না, কাগজ তৈরি করার জন্যে চাই জল, কেমিক্যাল, এনার্জি আরো কতো কী! সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার। আর আমরা কতো সহজে সেই কাগজ নষ্ট করি। তাই না? তোমরাই বলো খেলার ছলে কতো কাগজ আমরা নষ্ট করি। ছিঁড়ি কুটি, নৌকো বানাই, আরো কত কি করি। অথচ ইচ্ছে করলেই আমরা কিন্তু অনেক কাগজ বাঁচাতে পারি। আমরা সবাই যদি রোজ একটু করেও কাগজ বাঁচাই তাহলে শেষ পর্যন্ত তা কতোটা হয়ে দাঁড়ায় ভাবো একবার।

তাই শুকতারার বন্ধুদের বলি, তোমরা এতোদিন যা করেছো করেছো এখন থেকে আর কাগজ নষ্ট করো না। চেষ্টা করবে যতোটা সম্ভব কাগজ বাঁচাতে। সব সময় মনে রাখবে এক টন কাগজ তৈরি করতে দু-টনের ওপর কাঠ লাগবে। আর তার জন্যে দরকার হবে অনেক গাছ কাটার। আমরা শুকতারার বন্ধুরা তো গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, সেই সঙ্গে গাছ না কাটার পক্ষে প্রচার করছি। এবার এসো কাগজ বাঁচাও স্লোগান দিই। কারণ কাগজ তৈরির সঙ্গে গাছ কাটার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে।

আর একটা কথা মনে রেখো, অদরকারী কাগজ যেখানে সেখানে ফেলে দিও না। জমিয়ে রেখে কাগজ-কুড়ানীদের দিয়ে দিতে পারো, বিক্রিও করে দিতে পারো। ফেলে দেওয়া কাগজ থেকে আবার নতুন কাগজ তৈরি করা যায় জানো তো—এর জন্যে গাছ কাটতে হয় না। ধরো অনেকগুলো পাতায় পুরো লেখা হলো না। খানিকটা করে জায়গা বেঁচে আছে। আমরা তখন কি করি, পুরো পাতাটাই তো ছিঁড়ে ফেলে দিই। এবার থেকে লেখা পাতার ফাঁকা জায়গাটা কেটে নিয়ে স্লিপ প্যাড বানিয়ে নিও কেমন। এতেও দেখবে কতো কাগজ বাঁচবে। এই সামান্য কাজ দিয়েই আমরা কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য অন্তত খানিকটা রক্ষা করতে পারি। নয় কি? তাহলে শুকতারার বন্ধুদের এখন থেকে নতুন স্লোগান কি হলো—কাগজ বাঁচাও। ভুলে যেও না কিন্তু। কে কিভাবে কাগজ বাঁচাচ্ছো আমায় লিখে জানাবে কিন্তু।

ওদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে। শুকতারার এক ছোট্ট বন্ধু অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটা পুরোনো কবিতা নিজের নামে লিখে পাঠিয়েছে। সেই কবিতার সঙ্গে তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার চিঠিও ছিলো। তাই আমরা কিছু না ভেবেই বীথি পাঁজার কবিতাটা শ্রাবণ সংখ্যায় ছেপে দিয়েছিলাম। তারপর কি হয়েছে বুঝতে পারছো? দাদুমণিকে তোমরা যদি এইভাবে বার বার লজ্জায় ফেলো, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমাদের পাতা তুলেই না দিতে হয়। তোমরা কি বলো, কি হবে, তোমাদের পাতা কি তুলে দিতে হবে, নাকি তোমরা এবার থেকে শুধু তোমাদের লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি পাঠাবে? মনে রেখো, এই ব্যাপারে কিন্তু সতর্ক হবার সময় এসেছে। মনে রেখো, তোমাদের পাতায় শুধু তোমাদের লেখা আর তোমাদের আঁকা ছবিই ছাপা হয়। তাই কারো লেখা বা ছবি কপি করে পাঠাতে নেই। ওদিকে আবার দেখো বীথি পাঁজা ভুল করেছে বলে তোমরা অনেকেই চিঠি দিয়েছো। তাই বীথিকে বলছি, একবার ভুল করেছো বলে আর কখনো এমন কাণ্ড করো না। আমি চাই তুমি নিজে খুব ভালো লিখে এই ভুলের সংশোধন করে নেবে। সব থেকে ভালো হয় বীথি নিজে তুমি যদি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে নাও। তুমি শুকতারার ঠিকানাতেই চিঠি লিখতে পারো।

আজ তাহলে এই পর্যন্ত।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

তোমাদের দাদুমণি

জয় হিন্দ।

তোমাদের পাতা

অপূর্বকুমার দাস, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী, মালডোভা পি. কে. হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ

কাকাতুয়ার বুদ্ধি

একটি গ্রামে মোট আশিটি পরিবার ছিল। এই আশিটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের হর্তাকর্তা ছিল এক বুড়ি। সেই বুড়ির সংসারে একটা কাকাতুয়া ছিল। একদিন বুড়ি তার নাতনিকে দুধ খাওয়াতে বসেছে। কিন্তু নাতনি কিছুতেই দুধ খেতে চাইছিলো না। তা দেখে কাকাতুয়াটা বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমার নাতনিকে দুধ খাওয়াচ্ছি। বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, এই কে আছিস কাকাতুয়াটাকে ছেড়ে দে ও আমার নাতনিকে দুধ খাওয়াবে, আমার কাজও কমবে। বুড়ির কথা শুনে তার ছোট ছেলে এসে খাঁচাটা খুলে দিল। খাঁচা খোলামাত্র কাকাতুয়াটা উড়ে চলে গেল আর যাবার সময়ে বলে গেল, এখন আসি পরে এসে তোমার নাতনিকে দুধ খাওয়াব। তখন সবার মাথায় হাত। নাতনিকে দুধ খাওয়াতে বুড়ি ভুলে গেল। দুধটা বেড়ালে এসে খেয়ে গেল। বুড়ি হায় হায় করতে লাগল, আমার দুধও গেল কাকাতুয়াও গেল।

পিনাকী জাটী, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী রঘুনাথপুর নফর একাডেমী হাই স্কুল, রঘুনাথপুর

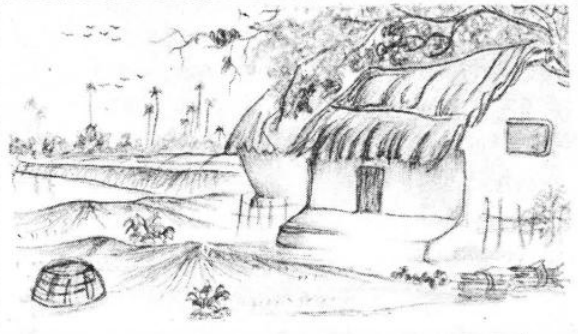

চিরদীপ ভৌমিক, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, পুরুলিয়া জিলা স্কুল, পুরুলিয়া

লিখব বলে

শুকতারাতে লিখব বলে
ভাবছি এক পদ্য।
অনেক ভেবে কিছুতেই
আসছে নাকো শব্দ।
রেগে গিয়ে কলমটা যেই
রেখে দিলাম ব্যাগে,
নতুন নতুন শব্দ যত
মাথার মধ্যে জাগে।
কলম নিয়ে লিখে ফেললাম
শব্দগুলি যত,
দেখলাম শেষে পদ্যটি যে
হয়েছে মনের মতো।
বন্ধুরা বলল দেখে, হয়েছে খুব খাসা
'শুকতারা'তে থাকে যদি, এইটুকু মোর আশা।

নীলাঞ্জন সাহা বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
নবেন্দ্র বিদ্যানিকেতন. নৈহাটি, ২৪ পরগনা

সোনালী সেন, বয়স চোদ্দ. নবম শ্রেণী. বেহালা শ্যামসুন্দরী বিদ্যাপীঠ

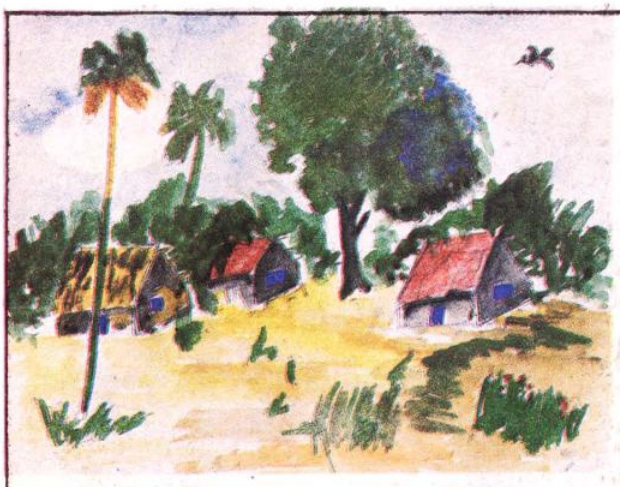

নীলাঞ্জন পাল, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী, রমলা পাল বিদ্যাপীঠ, হাওড়া

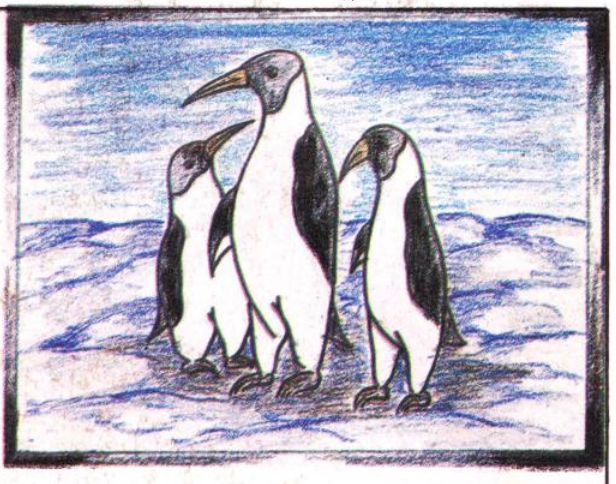

অজিতা চক্রবর্তী, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী, শিশু শিক্ষায়ন, শ্রীরামপুর

চাই

চাই না শাড়ি
চাই না গাড়ি
চাই না দাদা
বাংলো বাড়ি
চাই শুধু দই
হাঁড়ি হাঁড়ি।

মাখদুম মুস্তাফা
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী
জগদ্ধাত্রী বাণী মন্দির
নারিকেলডাঙা, কলকাতা

জয়িতা দত্ত, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
কাশীপুর ইংলিশ স্কুল

ছুটি

আজকে খুশি বেজায় খুশি
আজকে ছুটির দিনটি রে,
আজ সারাদিন খেলবো মোরা
নাচবো তা ধিন ধিন তা রে।
আজকে পড়া নয়তো পড়া
পড়া-পড়া করবো খেলাই,
ঝগড়া ভুলে মিষ্টি হেসে
সবার হাতে হাতটি মেলাই।

সঞ্চারী কোলে, বয়স নয়, তৃতীয় শ্রেণী
ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়,
হাওড়া

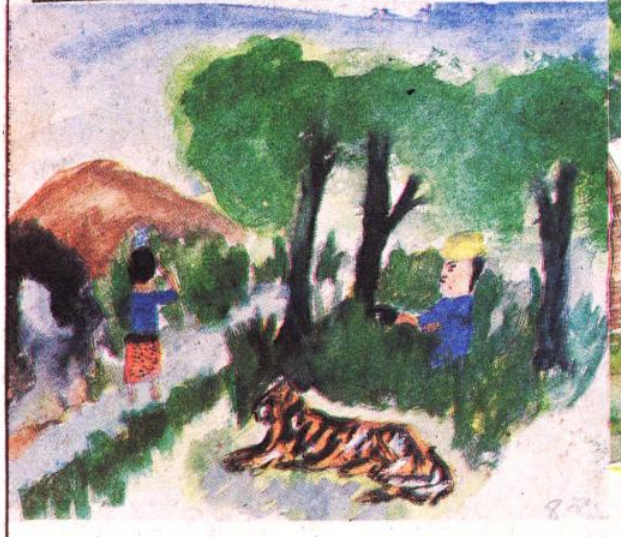

তমাল দাস, বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী, হাওড়া জিলা স্কুল

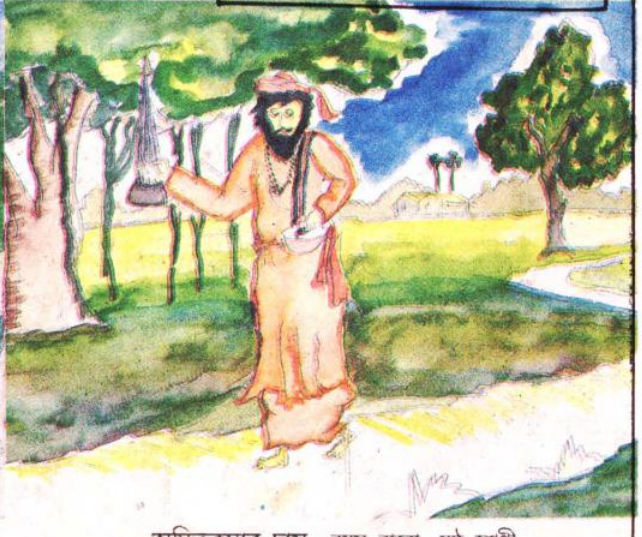

অমিতকুমার দাস, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
নিবাধুই হাই স্কুল, দত্তপুকুর

যুগ-যুগান্তের যাত্রী — ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

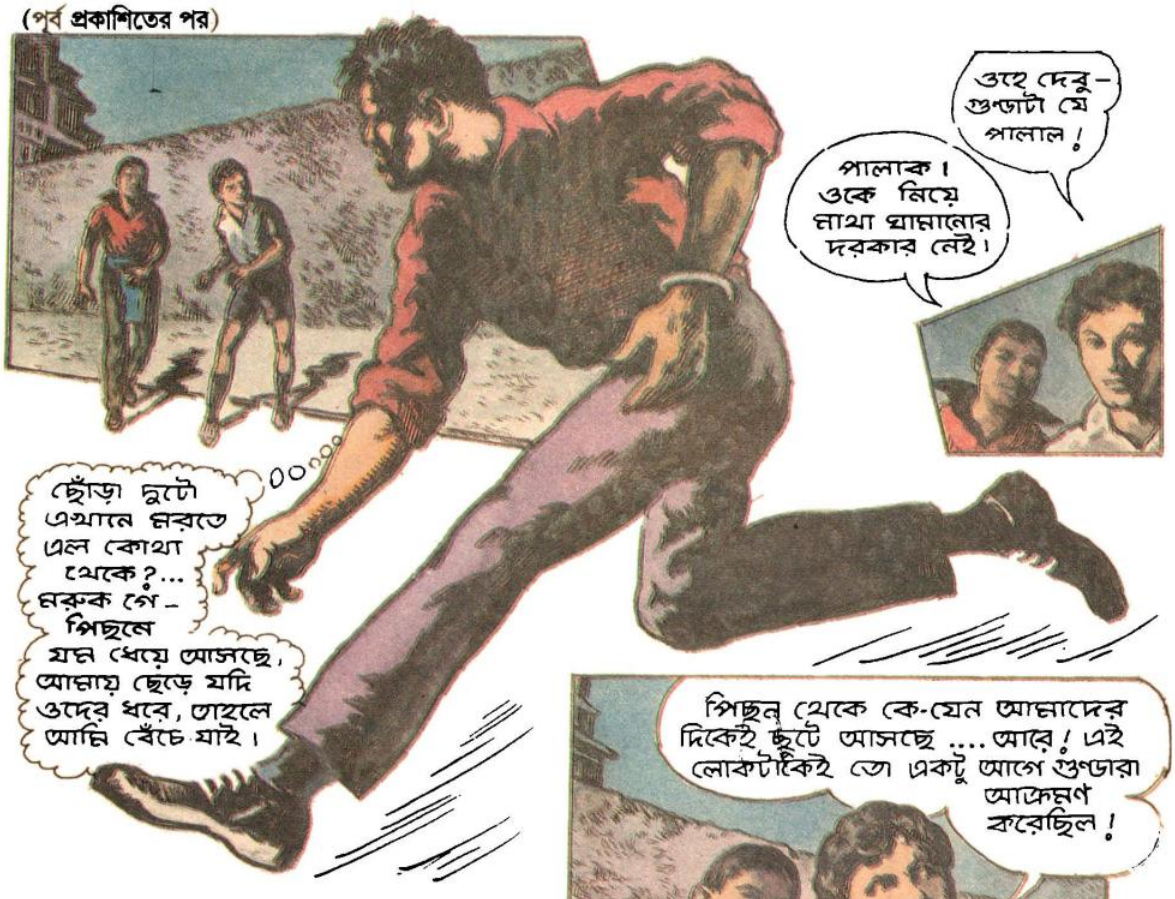

পথের উপর আবার বেজে উঠল ধাবমান পদশব্দ! পিছন থেকে দ্রুতবেগে কে-যেন ছুটে আসছে! সম্ভবতঃ কালো বাঘের মতো জন্তুটার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটে পালাচ্ছে কোন ব্যক্তি...

কী পাগলামি করছ দেবু? ভদ্রলোককে যেতে দাও। নিখিলদার কি হল দেখতে হবে না? তাছাড়া আমাদের পিছনে ব্ল্যাক প্যান্থার না-কি-যেন জন্তুটা রয়েছে—
সেটা যদি হঠাৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?
নিখিলদা ভালোই আছে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। ভদ্রলোককে ধরতেই হবে, নইলে বেচারা ভীষণ বিপদে পড়বে।
তুই কেরে? হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে ফেলে দিলি কেন? এত রাতে কি করছিস এখানে? এবার তুইও মরবি, আমিও মরব। এখনই পিছন থেকে ভয়ংকর জন্তুটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
ও মশাই! পালাচ্ছেন কেন?
কী-সব আবোল-তাবোল বকছেন? আমি একটা SHOW দেখে ফিরছি—একটু আগে এখানে যা-যা ঘটেছে, সবই দেখেছি, কিন্তু জন্তু-টন্তু কিছু তো দেখতে পাই নি।
কিছুই দেখতে পাও নি? তাহলে বলব তুমি চোখ থাকতেও কানা। বাঘের মতো জন্তুটা ভীষণ গর্জন করে তেড়ে আসতেই গুণ্ডাটা ছুরি ফেলে পালাল। তুমি বোধহয় জন্তুটার গর্জনও শুনতে পাও নি?
কোনও জন্তু-জানোয়ার আমার চোখে পড়েনি, তর্জন-গর্জনও শুনি নি—কিন্তু গুণ্ডাটাকে ছুরি ফেলে পালাতে দেখেছি। আর এখন আপনার শ্রীমুখের ভাষণ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। অতএব বুঝতেই পারছেন আমি কানা অথবা কালা নই। আসলে গুণ্ডাদের হামলার ফলে আপনার মাথায় গোলমাল বেধে গিয়েছিল। সাধারণ ভদ্রতাবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। এখন অনেকটা সামলে নিয়েছেন, ভদ্রতাবোধ ফিরে এসেছে, তাই "তুই" থেকে "তুমি" ধরেছেন। আমি অবশ্য রাগ করি নি। আমি জানি ভয় পেলে মানুষের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, মানুষ আবোল-তাবোল বকে।

[চলবে]

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

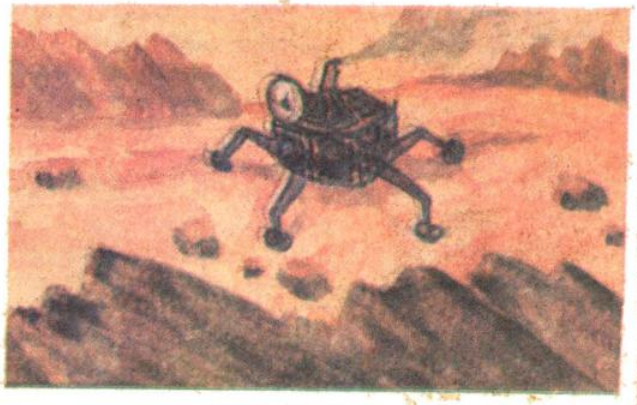

মঙ্গলে প্রাণের মেলা

আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর অন্যতম প্রতিবেশী মঙ্গল। এই মঙ্গলকে নিয়ে পৃথিবীর মানুষদের কতই না কল্পনা—মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে, তারা নাকি মানুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই রকম নানান গল্প। আদপৈ কিন্তু এর কোনোটাই সত্যি নয়। তবে মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক প্রকৃতিগত মিল আছে, যেমন জল। মঙ্গলে জলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এই জল আছে মাটির নিচে বরফ হয়ে। ঠিক আমাদের পৃথিবীর বরফ ঢাকা দুই মেরু প্রদেশের মতো। মঙ্গলের মরুভূমিগুলিও অনেকটাই পৃথিবীর মরুভূমির মতো। এছাড়া মঙ্গলে আছে অনেক আগ্নেয়গিরি।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন একদিন মঙ্গলে মানুষ উপনিবেশ তৈরি করবে সেটা হবে ২০৫০ সালে। এই উপনিবেশ তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা একটা সম্ভাব্য কর্মসূচী নিয়েছেন যেটাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে রোবট পাঠানো হবে। সেই রোবট মঙ্গলের বাতাসে ছড়িয়ে দেবে ফ্লোরোফুরো কার্বন, যা গ্রীনহাউস এফেক্ট তৈরি করে মঙ্গলের তাপমাত্রা বাড়াবে। একবার তাপমাত্রা বাড়তে আরম্ভ হলে মঙ্গলের মাটি থেকে বেরিয়ে আসবে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। গ্রীনহাউস এফেক্ট এমনভাবে বাড়ানো হবে যাতে গ্রহের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে ওঠে।

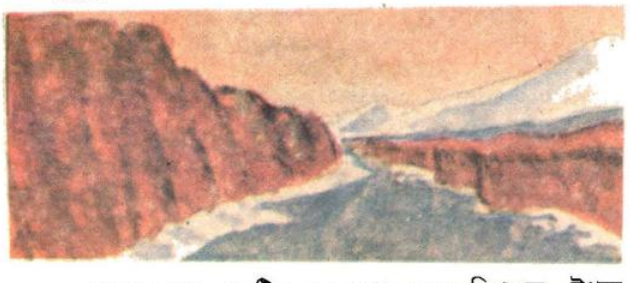

একবার লাল গ্রহটির তাপমাত্রা বেড়ে হিমাঙ্কের উপরে এলেই মাটির নিচের বরফ গলে জল হবে। মঙ্গলের লেক, নদী এমনকি সমুদ্রগুলিও জলে ভরে উঠবে। এভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হবে।

এবার আরম্ভ হবে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ। মঙ্গলের মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। তাই প্রথমে সেখানে বপন করা হবে নীলাভ সবুজ এককোষী নস্টক নামে শৈবাল। এছাড়া কিছু বীজাণু যারা মঙ্গলের পাহাড় থেকে উদ্ভিদের বাঁচার জন্য বিভিন্ন মৌল উপাদান যেমন ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদিকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে তুলবে। একবার শেওলা জন্মালে তারা অক্সিজেন তৈরি করে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেবে। অক্সিজেনের উপস্থিতি বিশেষ জিন প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

এভাবে সবকিছু ঠিকমতো চললেই মঙ্গলের পরিবেশের এক সুন্দর পরিবর্তন হবে। সমুদ্রের পরিবেশ বদলাবে। মাটির পরিবেশ, আবহাওয়ার পরিবেশ বদলাবে। ভীষণ ঠাণ্ডা, শুকনো কঠিন মরু পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর স্তন্যপায়ীদের বাসোপযোগী হয়ে উঠবে। সবুজ গাছে ভরে উঠবে লাল মঙ্গল গ্রহ। তখন আরম্ভ হবে চতুর্থ পর্যায়ের কাজ। প্রথমে যাবে বানর জাতীয় প্রাণী। তারপর একদিন পুরনো কল্পগল্প সব সত্যি হবে। মঙ্গল গ্রহে বাস করবে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ।

দুখন-সুখনের গল্প

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

দুখন আর সুখন, দু'ভাই। ওদের মিল শুধু নামেই। মনে খুব গরমিল। তবে এই গরমিলের জন্য দুখনকে একটুও দায়ী করা যায় না। কথায় কথায় ছোটভাই সুখন ওর দাদার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে। কটু কথা যা বলার, তা বলে যায় শুধু সুখন। দুখন জবাবে কিচ্ছুটি বলে না। চুপচাপ থাকে। কারণ ও তো জানে, কথায় কথা বাড়ে।

রাতের কালো রং ফরসা হয়ে যখন সুয্যিঠাকুর পুব আকাশের সিঁড়ির ধাপে লাল হয়, দুখন তৈরি হয়ে যায়। কাঁধে তুলে নেয় বাপের আমলের কুড়ালখানা। টেনে নেয় গুলঞ্চলতা পাকানো দড়িটা। তারপর মাঠ পেরিয়ে, খাল টপকিয়ে হাজির হয় বাঘমারীর জঙ্গলে।

ঠক্-ঠক্-ঠক্—দুখন কাঠ কাটে সারাদিন। এগাছ-ওগাছ-সেগাছ থেকে শুকনো ডাল কেটে বাঁধে ঢাউস বোঝা। তারপর ? তারপর সেই কাঠের বোঝা গঞ্জের হাটে বেচে সে যখন বাড়ি ফেরে, তখন দিনের বয়েস অনেক বেড়ে গেছে।

দুখনের পেট খিদেয় হু-হু জ্বলতে থাকে। বাড়ি ফিরে কাঠ-বেচা পয়সা ভাই সুখনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বসে পড়ে ওর পাতায় ছাওয়া চালাঘরটার বারান্দায়। তারপর হাঁফ ছেড়ে বলে, 'কই গো, কে আছো...হাতে পলা-দুই তেল দাও...মেখে নদীতে গোটা দুই ডুব দিয়ে আসি!'

তা শুনে ভাই সুখন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'সারাদিন বনে কাটিয়ে তিন পয়সা রোজগার করে গায়ে-মাথায় মাখার তেল জুটবে কোথা থেকে শুনি!'

দুখন আর কোনো কথা বলে না। রুখু মাথায় স্নান করে আসে। দুখনের বৌয়েরও সুখনের ভয়ে স্বামীর হাতে দু'পলা তেল দিতে সাহস হতো না। স্নান সেরে এসে এক চিমটি নুন মেখে রাঙা-রাঙা চাট্টিখানি ভাত খেয়ে দুখন কোনোরকমে পেটের জ্বলুনি থামায়।

খেয়েদেয়ে বারান্দায় বসতেই দু'চোখে ভাত-ঘুম ভিড় করে আসে। ঢুলুনি এসেছে কি আসেনি, অমনি ছোটভাই সুখন হুঙ্কার ছাড়ে, 'গরু-ছাগল গোয়ালে ঢোকাবে কে শুনি! সন্ধ্যে হয়ে এলো খেয়াল নেই বোধহয় ! বোঝাখানাক কাঠ বেচে এসে কি বাদশা হয়ে গেলে নাকি!'

দুখন ছোটভাইয়ের কথায় কোনো অভিযোগ রাখে না। টুকটুক করে পা চালায় গোয়ালঘরের দিকে।

দুখন-সুখনদের পূর্বপুরুষেরা সবাই কাঠুরে। বাপ-ঠাকুরদা কাঠ-বেচা পয়সায় কিছু জমিজমা রেখে গেছে। আর তা ভাঙিয়েই নতুন কিছু ঘর-দোরও করা গেছে। তাই বড়ভাই দুখন কষ্ট হলেও জাত-ব্যবসা বজায় করে চলে। আর তারই ফাঁকে বাপ-পিতেমোর রেখে যাওয়া জমি-জিরেত আবাদ করে, ফসল ফলায়। কিন্তু ফসল-বেচা সব টাকা ওঠে ছোটভাই সুখনের হাতে। সুখন কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। তাও দাদা দুখনেরই দৌলতে। অল্পবয়েসে বাপ-মা মারা যেতে পুরো সংসারের বোঝা চাপে বড়ভাই দুখনের কাঁধে। পাছে পাড়া-পড়শীরা কিছু বলে, সুখন মনে মনে দুঃখু করে, তাই দুখন সংসারের সব কাজ নিজে সামাল দিয়ে সুখনকে সুযোগ করে দিয়েছিল পড়াশোনার।

সেই পড়াশোনার অহংকার ছিল ছোটভাই সুখনের মনে। বড়ভাই দুখনকে শুনিয়ে বলতো, 'লেখাপড়া জানো না, নিরেট মুখ্খু তুমি। টাকা-পয়সার হিসেব না রাখলে সংসার এতদিনে লাটে উঠতো। মাঠে-জমিতে গতর খাটাতে সবাই পারে। কিন্তু মগজ খাটিয়ে হিসেব রাখা.....'

সুখন থাকে নতুন বানানো ভালো ঘরে। দুখন থাকে তার একমাত্র ছেলে রূপাই আর তার মাকে নিয়ে ঠাকুরদার আমলের সাবেকী নড়বড়ে ঘরখানায়। রূপাই কিন্তু ওর কাকাদের নতুন ঘরের থেকে ওদের ওই পুরনো ঘরখানাকেই পছন্দ করে।

গরমের দিনে ঠিক দুপুরে মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে ঘরের কোণায় মাকড়সার জাল বোনা, টিকটিকির ওঠা-নামা, বাঁশের বাতায় কুমোরে পোকার ঘর বানানো দেখতে রূপাইয়ের খুব ভালো লাগে। ঘরের চালে এসে বসে ঘুঘু, বসে শালিক। ওদের ডাক শুনতে শুনতে, টিকটিকির ওঠা-নামা গুনতে গুনতে কোন ফাঁকে ও ঘুমিয়ে পড়ে। চাঁদনী রাতে চালের ফোকর দিয়ে আলো-ভরা এক টুকরো আকাশ দেখতে ওর কি ভালোই লাগে!

রূপাইয়ের খুড়তুতো ভাই সোনাই যখন পাঠশালায় পড়তে যায়, ও তখন ওর বাবার সঙ্গে মাঠে যায়। বাবাকে কাজে সাহায্য করে। জমি থেকে খুঁটে খুঁটে তোলে ঘাস, তোলে আগাছা। মাটি টেনে দেয় ফসল-গাছের কোমরে। এই বয়েসে কুড়ালকে ও বেশ বশ মানিয়েছে। গাছের শক্ত ডাল ওর কোপের কায়দায় দু-চার ঘায়ে টুকরো হয়ে যায়। সুন্দর করে মাথার ওপর দিয়ে কুড়ালটাকে চালিয়ে রূপাই কোপ বসাতে পারে গাছের গায়ে।

বাবাকে দেখে রূপাইয়ের বড় দুঃখু হয়। কি হাড়-ভাঙা খাটনিটাই না খাটে ওর বাবা। আর কাকা? ফিটফাট পোশাক পরে খায়-দায় আর হুকুম করে ওর বাবাকে। গাজন-মেলায় গেলে রূপাইকে এক পয়সা দেবার সাধ্যি নেই ওর বাপের। কাকার কাছে চাইতে গেলে পয়সা তো পায়ই না, বরং উল্টে বাজে কথা শুনতে হয় ওর বাপকে।

সুখন বলে, 'নিজে সারা জীবন কিছু করতে পারলে না। তার ওপর ছেলেটাকে এই বয়েস থেকে বাজে খরচ শেখাচ্ছো? গাজন-মেলায় ছেলের হাতে পয়সা দেবার মতো রোজগার আগে করো, তারপর ছেলেকে উস্কানি দেবে।'

ওদিকে সোনাই ফিরতো মেলা থেকে নানান খাবার আর খেলনা নিয়ে। কাকাদের নতুন ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে রূপাইয়ের কপালে ছিটে-ফোঁটা খাবার জোটে। বিনিময়ে রূপাইকে ওর কাকা সুখন শোনাতো নানান বাঁকা কথা। 'বলি, মেলার খুচরো খাবারে তোর পেট ভরবে রে? তোর চাই পুঁটলিখানেক মুড়ি। এসব খাবার তো তোর দাঁতের ফাঁকেই পড়ে থাকবে। দে রে সোনাই, দুটো সিঁড়ি ভাজা ফেলে দে। নইলে হ্যাংলাটা নড়বে না।'

সেদিন সকালবেলা। ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই, কোথ্থাও কিছু নেই, হঠাৎ সুখন তার দাদা-বৌদিকে বলে বসে, 'দ্যাখো, দিনকাল যা পড়েছে, তাতে তোমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যাবে না। তোমরা পথ দ্যাখো। এ বাড়িতে তোমাদের ঠাঁই হবে না।'

রূপাইয়ের মা তা শুনে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। দুখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ছি-ছি, তুমি না সুখনের বৌদি? তুমি ওর মায়ের মতন। ও যা বলে বলুক। তুমি কিছু বলো না। ও কষ্ট পাবে।'

পরের দিনই দুখন রূপাই আর রূপাইয়ের মাকে নিয়ে চলে গেল বাঘমারীর জঙ্গলের কাছাকাছি, একটা ফলসা গাছের নিচে। দু'বাপ-বেটায় মিলে বনের বেত আর বাঁশ কেটে বানিয়ে নিলে ঘর। দু'টো চাল ঢেকে নিলো গোলপাতা দিয়ে। একদিন ওই বাঘমারীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসে দুখনের ঠাকুরদাদার বাবা বাঘের মুখোমুখি হয়েছিল। তারপর চলেছিল বাঘে-মানুষে লড়াই। শেষ-মেষ কুড়ালখানা হাঁ করে কামড়াতে আসা বাঘটার মুখে ঢুকিয়ে দিতে বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। আজ আর ও জঙ্গলে বাঘ না থাকলেও সেই থেকে ওর নামই হয়ে যায় বাঘমারীর জঙ্গল।

বিরাট ওই জঙ্গল। কোথায় যে তার শেষ, তা কেউ বলতে পারে না। জঙ্গলের উত্তর দিকটায় যাওয়া নিষেধ। দুখনদের কাঠুরে পূর্বপুরুষেরাও কেউ যেতো না জঙ্গলের ওই উত্তর দিকটায়। কেউ কেউ আবার সাহসে ভর করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখে এসেছে। বনের ফাঁকে ফাঁকে তারা দেখেছে, একটা বিরাট জল-তকতকে দীঘি। তার জলে লাল-নীল-হলদে-সবুজ-সোনালী পদ্মের ছড়াছড়ি। তারই পাড়ে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। ওই ফাঁকা জায়গাটায় নাকি রাত্তিরে তৈরি হয়ে যায় শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। পরীরা নেমে আসে আসমান থেকে। সাঁতার কাটে দীঘির জলে। তারপর ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত পরীর দল ওই প্রাসাদে নাচ-গান-আমোদ-আহ্লাদ করে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পরীরা উধাও হয়। আর শ্বেতপাথরের প্রাসাদও অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার রাত নামলে ওই একই ব্যাপার।

রূপাই শুনেছে সে সব খবর ওর বাবা দুখনের কাছে। বাপের সঙ্গে সেও কাঠ কাটতে যায় কিনা!

একদিন কাঠ কাটার ফাঁকে দুখন ছেলেকে বলেছিল, 'দ্যাক্ বাপ, কাঠ কাটা আমাদের জাত-ব্যবসা। এ কাজ ছাড়িসনি। তবে কখ্খনো এই বাঘমারীর জঙ্গলের উত্তর দিকে কাঠ কাটতে যাসনি।'

ফলসা গাছের নিচে এখন রূপাইদের সংসার। বাপ-বেটা দু'জনেই কাঠ কাটে। কাঠের বোঝা নিয়ে চলে যায় গঞ্জে। বিক্রী করে কাঠ। কিনে আনে চাল-ডাল-তেল-মরিচ-মশলা।

অভাবের সংসার। তবু রূপাইয়ের এখানেই ভালো লাগে। কাকার সঙ্গে এক সংসারে থাকতেও ওদের বাপ-বেটাকে খাটতে হতো। তার ওপর ছিল কাকা সুখনের ধমক আর গালিগালাজ। ওর বাপ মুখ বুজে সব সহ্য করতো। বড় দুঃখু হতো রূপাইয়ের। অমন গাধার খাটনি খেটেও বাবা কোনোদিন কাকার কাছে নাম পেলে না। দাম পেলে না গতর খাটানোর।

সেদিন সকালে উঠে দুখন রূপাইকে বলে, 'রূপাই, আমার শরীরটা আজ ভালো নেইরে বাপ। আজ তুই যা পারিস একাই কাঠ কাটগে যা।'

রূপাই গত ক'দিন ধরে দেখেছে, মাথায় কাঠের বোঝাই নিয়ে বাবার পা দুটো কেমন যেন টলছে। আগের থেকে কেমন যেন রোগাও হয়ে গেছে। তাই রূপাই ওর বাবার কথার জবাবে বলে, 'খুব ভালো কথা বাবা। আমি একাই যাবো। মা, তুমি একটুও ভেবো না। দাও তো দেখি কুড়ালখানা আর গুলঞ্চ লতার দড়িটা।'

রূপাই বাঘমারীর জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটে আর ভাবে, জঙ্গলের উত্তর দিকটায় একবার গিয়ে দেখলে কেমন হয়! ভাবাও যা, কাজও তাই। রূপাই কুড়ালটা কাঁধে তুলে এগিয়ে যায় জঙ্গলের উত্তর দিকে।

রূপাই চলেছে তো চলেইছে। জঙ্গলের আর শেষ হয় না। কত রকমের গাছ সারি সারি সব দাঁড়িয়ে। কত রঙ-বেরঙ তাদের পাতা। কত বাহারে ফুলের উঁকিঝুঁকি পাতার ভিড়ে, শাখার আগায়। কত নাম-না-জানা পাখিরা বাসা বেঁধেছে গাছেদের কোটরে, ডালে। মাঝে মাঝে গো-সাপ, নেউল, সাপ-শেয়াল নিচে পড়ে থাকা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে খসখস আওয়াজ তুলে একদিক

দেখে বসে আছে এক বুড়ীমা।

থেকে আর একদিকে চলে যায়। ওরা রূপাইকে কেউ কিচ্ছুটি করে না।

রূপাই হাঁটছে তো হাঁটছেই। পাশের দেবদারু গাছটার ডাল থেকে একটা লম্বা ঠোঁটওলা পাখি ডেকে উঠলো। ডাক শুনে রূপাইয়ের মনে হলো, পাখিটা যেন স্পষ্ট মানুষের গলায় বলে উঠলো, 'এগিয়ে যা...এগিয়ে যা...'

রূপাই গাছটার দিকে তাকিয়ে পাখিটাকে দেখলো। কি সুন্দর ওর পালকের রঙ। যেন এক একটা সোনার পাত। আর ওর লম্বা লেজটা থেকে যেন চিকন জরি ঝুলছে। হঠাৎ রূপাইয়ের নজরে পড়লো, সামনে একটা দীঘি। অজস্র গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দীঘির কাকচক্ষু জলে ফুটে থাকা রঙবাহারে পদ্মফুলের সারি। রূপাই বুঝতে পারলো, এই সেই দীঘি, যার জলে রাতে সাঁতার কাটে পরীর দল।

'কে, রূপাই?'

রূপাই চমকে ওঠে। এমন বনে কে মানুষের গলায় কথা বললো? তার নাম ধরে এখানে কে ডাকলো? রূপাই এদিক-ওদিক চাইতেই দেখে ছাতার মতন দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাহাড়ী ঝাউ গাছের নিচে বসে আছে এক বুড়ীমা। তার পিঠে এক জোড়া ডানা।

রূপাইয়ের বুঝতে বাকি থাকে না, ওই বুড়ীমাও পরী। বুড়ী পরীর চাউনি ওর মায়ের মতো স্নেহ মাখা। রূপাইয়ের একটুও ভয় করে না ওকে দেখে। বুড়ী পরীর দু'চোখের টানে রূপাই তার কাছে না গিয়ে পারলো না। লোহা যেমন চুম্বকের দিকে এগিয়ে যায়, রূপাই তেমনি হাজির হয় বুড়ী পরীর কাছে।

রূপাই বুড়ী পরীকে প্রণাম করে বলে, 'তুমি আমার নাম জানলে কি করে গো?'

বুড়ী পরী বললো, 'আমরা কাকে না চিনি বলো? আমরা উড়ে বেড়াই, ঘুরে বেড়াই সব দেশে, সব গাঁয়ে, সব ঘরের কাছাকাছি। আমরা দুনিয়ার ভালো মানুষদের বড় ভালোবাসি। তোমার বাবার নাম তো দুখন? সেও তো কাঠ কাটে এই বনে। এখন তোমরা তো আছো ওই ফলসা গাছের নিচে, তাই না? এবার কিন্তু দুখনের দুঃখ আর সুখনের সুখ, দুই-ই সরবে।'

রূপাই বুঝতে পারলো না বুড়ী পরীর সব কথা। তবে অবাক হলো ভেবে যে, বুড়ী পরী তাদের খুঁটিনাটি সব খবর জানে।

'আয়, আয়', বুড়ী পরী ডাক দিতেই দুটো বড় বড় চার পেয়ে জন্তু এসে হাজির হলো তার কাছে। দেখতে ইঁদুরের মতো, তবে বেশ বড় বড়।

বুড়ী পরী বললো, দাও তো রূপাই তোমার গুলঞ্চ লতার দড়িটা।'

দড়িটা নিয়ে বুড়ী পরী ওই জন্তু দুটোর গলায় বেঁধে দিয়ে রূপাইকে বলে, 'নাও, এ দুটোকে তোমার সঙ্গে নাও। এরা দিনের আলোয় থাকে জন্তু হয়ে। রাতে হয় হাত-পা-ওলা মানুষের মতন এক রকম জীব। কাল থেকে তোমাকে বা তোমার বাবাকে বনে কাঠ কাটতে আসতে হবে না। সূর্য অস্ত গেলেই এদের ছেড়ে দেবে। এরাই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে গাদা করে দেবে তোমাদের কুঁড়ের পাশে। বেলা হলে এরাই কাঠের বোঝা পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে গঞ্জের হাটে। যাও, দড়ি ধরো, এদের নিয়ে যাও।'

দড়িটা ধরে রূপাই সামনে তাকিয়ে দেখে, বুড়ী পরী আর সেখানে নেই। একঝলক হাওয়া পাশের গাছগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে উধাও আকাশে। কেটে রাখা কাঠ বুড়ী পরীর দেওয়া জন্তু দুটোর পিঠে চাপিয়ে রূপাই বাড়ি ফিরে এলো।

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত
উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(হায়ার সেকেণ্ডারী • জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রশ্নোত্তরে)
সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

অত বড় বড় দুটো ইঁদুরের মতন জন্তু দেখে আর রূপাইয়ের মুখে সব কথা শুনে ওর মা-বাবা তো অবাক!

রূপাই বুড়ী পরীর দেওয়া জন্তু দুটোকে ওদের দু'চালা ঘরের পাশে একটা খোঁটায় বেঁধে রাখলো। না, রূপাই সেদিনই ওদের আর বোঝা বইয়ে কষ্ট দিতে চাইলো না। তাই সব কাঠ নিজে মাথায় নিয়ে গঞ্জের হাটে বেচে এলো। জন্তু দুটোর জন্যে কিনে নিয়ে এলো বেশ কিছু দানা।

দিনের আলোর বেড়া টপকে তখন সন্ধ্যে নামবে নামবে করছে। রূপাই জন্তু দুটোকে ছেড়ে দিলো। ওর কাণ্ডকারখানা ওর বাবা-মা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে।

পরের দিন ভোর হতে না হতে রূপাই বিছানা ছাড়লো। কারণ বুড়ী পরীর দেওয়া জন্তু দুটো কি করলো না করলো, তা দেখতে হবে তো! রূপাই ওদের ঘরের আগল ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অবাক হয়ে যায়। ভোরের ঝাপসা আলোয় ও দেখলো, এক রাশ কাঠ গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে ফলসা গাছের নিচে ঘাসে ঢাকা জায়গাটায়।

ওদিকে সুখনের সুখের দিনও ফুরিয়ে এলো। দুখনের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সারা গাঁয়ে আর তার চারপাশে। কারণ ভালো মানুষ বলে দুখনকে সবাই ভালোবাসত। খবরটা কেমন করে যেন রাজামশায়ের কানেও উঠলো।

একদিন সকালে সুখনের ঘুম ভাঙলো রাজামশায়ের লোকদের হাঁক-ডাকে। বাইরে বেরিয়ে আসতে রাজার লোকদের একজন সুখনের হাতে ধরিয়ে দেয় একখানা কাগজ। তাতে লেখা, 'আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি জাত-ব্যবসা করে না, আমার দেওয়া জমি-জমা রাখিবারও তাহার কোনো অধিকার নাই। তোমার দাদা দুখন জাত-ব্যবসা করিত। কিন্তু তাহাকে বিনা দোষে সংসার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব জমি-জমা হইতে তোমার অধিকার চলিয়া গেল।'

রাজার আদেশ জারি করা কাগজখানা পড়ে সুখন কেঁদে ফেলে। কিন্তু ততক্ষণে রাজার লোকেরা তার নজরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেকটা দূরে।

ওদিকে দুখনের সংসারে সুখের সীমা নেই। বুড়ী পরীর দেওয়া জন্তু দুটোর দৌলতে তার সংসারের হাল ফিরে গেল। ওরা বাপ-বেটা কেউ আর বনে কাঠ কাটতে যায় না। বিকেলে জন্তু দুটোর পিঠে কাঠের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চলে যায় গঞ্জের হাটে। কাঠ বেচে কিনে আনে চাল-ডাল-তেল-নুন-মরিচ-মশলা-কাপড়-গামছা।

রূপাই কিন্তু কোনোদিনই ওর পোষা জন্তু দুটোর জন্যে দানা কিনতে ভোলে না। আর ভোলে না বুড়ী পরীকে—যার জন্যে ওদের এই সুখ।

হিলি ডাকবাংলোয়

হিমাংশু সরকার

লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা মালদা বাসস্ট্যান্ডে। তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে-চারটে। বাসটা বহরমপুর ছেড়ে মালদা পৌঁছতে লোকটি ঘাড়ের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, বাবু বুঝি কলকাতা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত জেগেই ছিলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। লোকটির কথায় ঘুমের রেশ কেটে যেতে পাশ ফিরে দেখি আমার পাশের সিটেই জুতসই হয়ে বসে আছে লোকটি। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। সারা মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। আধময়লা ছেঁড়া পোশাক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। বড় বড় দুটো দাঁত মাড়ি ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। মুখে হাসি।

লোকটিকে দেখে অবাক হলাম। কলকাতা থেকে রাত ন'টায় যখন হিলি এক্সপ্রেস ছাড়ে তখন আমার পাশের সিটে বসেছিলেন এক মহিলা। পথে কখন নেমে গেছেন টের পাইনি। এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কলকাতা থেকে যারা আমার সঙ্গে বাসে উঠেছিল তাদের অনেকেই নেমে গেছে। বহরমপুরেও বাস ভর্তি ছিল। এখন একদম ফাঁকা। মালদাতেই বোধহয় নেমে গেছে অধিকাংশ লোক। আসলে বহরমপুর ছাড়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ায় বাসটা কখন যে মালদায় এসে থেমেছে, কতক্ষণই বা থেমে আছে কিছুই টের পাইনি।

ভোর হতে তখনও বাকি। বাসস্ট্যান্ড দেখলে যদিও মনে হয় না এখন শেষ রাত। দিব্যি গমগম করছে সমস্ত চত্বর। চা-মিষ্টির দোকান সব খোলা। বেঞ্চিতে বসে তখনও আড্ডা মারছে কিছু ছেলে। বেচা-কেনা চলেছে এই শেষ রাতেও। বাস কিছুক্ষণ থেমে আবার চলতে শুরু করতেই লোকটি আবার প্রশ্ন করল, হিলি যাচ্ছেন বুঝি?

আবার চমকে উঠলাম লোকটির কথায়। গণৎকার নাকি! নাকি হিলি এক্সপ্রেস বলেই যারা এখনও বসে আছে বাসে তাদের সবাইকেই হিলির যাত্রী ধরে নিয়েই কথা বলছে লোকটি। ওর অযাচিত এ ধরনের আলাপ ভাল না লাগলেও ভদ্রতার খাতিরে এবার বলতেই হলো, হ্যাঁ, হিলি যাচ্ছি।

তাই বলুন। দেখেই বুঝেছি বাবু হিলি যাবেন বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। 'তা উঠবেন কোথায়? ওখানে তো হোটেল-টোটেল ভাল নেই। ডাকবাংলোতেই উঠবেন বোধহয়?

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দুহাত জোড় করে মাথা নিচু করে বলল, পেন্নাম হই স্যার। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আপনার দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পেরেছি আপনি ডাকবাংলোতেই উঠবেন। তা ভালই হলো। চলুন। আমি তো সঙ্গেই রয়েছি কোনো অসুবিধা হবে না।

লোকটির কথাবার্তার ধরন দেখে ক্রমশই বিস্ময় বাড়ছিল আমার। ও নিশ্চয় হিলিতেই থাকে। শুনেছি ওখানে স্মাগলারদের আনাগোনা বেশি। ওদের দলের কেউ কিনা কে জানে! ব্যাপারটা বোঝার জন্য জিগ্যেস করলাম, আপনি হিলিতেই থাকেন?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল। আমায় আপনি বলবেন না স্যার। তুমি বলবেন। আমি হিলি ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার বুধন মণ্ডল। আপনার রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার সব ব্যবস্থা আমিই করব স্যার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো আমার কাছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। ভালই হলো বুধনকে কাছে পেয়ে। অজানা অচেনা জায়গায় আর ডাকবাংলো খুঁজতে হাতড়ে বেড়াতে হবে

না।

বুধনকে জিজ্ঞেস করলাম, তা এদিকে কোথায় এসেছিলে তুমি?

বুধন বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, আজ্ঞে স্যার একটু বাড়িতে গিয়েছিলাম। মালদায় আমার বাড়ি কিনা। ভাবলুম পুজোর মুখে একবার সবার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাছাড়া ওখানে বসে বসে আর ভালও লাগছিল না।

বসে বসে কেন? এর মধ্যে ডাকবাংলোয় কেউ আসেনি বুঝি?

কি যে বলেন স্যার! এর মধ্যে কি আবার, গত দুবছরের মধ্যে কেউ আসেনি। এখানে কি দেখার আছে যে লোকজন আসবে? এখানে কোনো ভদ্রলোক থাকতে চায়, না আসতে চায়? তাছাড়া সব সময়ই তো গণ্ডগোলের আশঙ্কা। নেহাৎ নিরুপায় না হলে কোনো ভদ্রলোকে থাকতে চায় না এসব এলাকায়।

সেকি! হিলি তো একটা সাব-টাউন বলেই শুনেছি।

এবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে শেয়ালের মতো হাসল বুধন। সে ছিল বটে এক সময়। বৃটিশ আমলে। এই ডাকবাংলো তো তখনই তৈরি হয়েছিল স্যার। সাহেবরা আসতো। ইয়ার দোস্ত নিয়ে এখানে এসে উঠতো। হৈহৈ করে দিন কাটাতো। সেসব এখন আর নেই। দেশ ভাগ হওয়ার পর শহরের অনেকটাই চলে গেছে বাংলাদেশের ভাগে। আমাদের ইদিকে রয়েছে কটা টিনের চালাঘর, কিছু খেত-খামার আর সাহেবদের এই বাংলোটা। এখন ইদিকে সাধ করে কে আর বেড়াতে আসবে বলুন।

হিলিতে এসে যখন বাস থামল তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। বাস থেকে নেমে বুধনের কথাই সত্যি মনে হলো। নামেই টাউন। আসলে বাস রাস্তার ধারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চটির মতো জায়গাটা। ছড়ানো ছিটানো কিছু টিনের চালাঘর দোকান-পাট। ছোট্ট একটা বাজার। এই হলো হিলি। কেমন ছন্নছাড়া নিঝুম এলাকা। মালপত্র নামিয়ে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে এল বুধন, তারপর আমায় নিয়ে গেল ডাকবাংলোয়।

ডাকবাংলোয় ঢুকেই বুঝতে পারলাম বুধন এতক্ষণ বকবক করে যা বলেছে তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। বহুদিন এখানে কোনো লোকজনের পা পড়েছে বলে মনে হলো না আমার। বাংলোর সামনের জমি যেটা আগে ছিল সাহেবদের লন, তা এখন আগাছার জঙ্গলে ভরা। বারান্দার মেঝে ফেটে ফুটে চৌচির। ঘরগুলো ভাল আছে বটে কিন্তু ঝাড়পোঁচ হয়নি বহুদিন। ঘরের সর্বত্র ধুলোর আস্তরণ, সেই সঙ্গে একটা বোটকা গন্ধ।

বুধন আমার মালপত্র নামিয়ে দিয়েই ঝেড়েমুছে যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল শোবার ঘরটা। তবু একটা অস্বস্তি বিঁধেই রইল মনের ভিতর।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সীমান্ত ঘুরে এসেছি আমি। আজকাল হঠাৎ অনুপ্রবেশ নিয়ে হৈচৈ শুরু হওয়ায় এ ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। এর আগেও সাংবাদিকতার পেশায় যেতে হয়েছে এখানে ওখানে। এবারও পুজোর মুখেই বেরোতে হয়েছে বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু কোথাও এমন নিঃসঙ্গ সীমান্ত দেখিনি। সব কেমন চুপচাপ। লোকজনের হৈচৈ একেবারেই নেই। সাত সকালেই দোকানের ঝাঁপ খোলা বটে কিন্তু কেনাকাটা নেই। নেহাৎ দোকান খুলতে হয় বলেই যেন খোলা। ডাকবাংলোটাও এমন ফাঁকা আর নির্বান্ধব এলাকায় যে গা ছমছম করে দিনের বেলাতেও।

দুপুরে খেতে বসে বুধনকে এ কথা বলায় খ্যাঁকখ্যাঁক করে আবার হাসল ও। লোকটা সব সময়ই হাসছে। কখনও মিটিমিটি কখনও খ্যাঁকখ্যাঁক করে। বলল, আপনাকে আগেই বলেছি না স্যার, এখানে কেউ আর আসে না আজকাল। বলেই প্রশ্ন করল, বাবু বুঝি গোয়েন্দার কাজ করেন?

সর্বনাশ! বলে কি লোকটা! বললাম, না না। আমাকে দেখে কি তোমার গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে? আমি এমনি বেড়াতে এসেছি।

ও। বলে একটু সুর টেনে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

খাওয়াদাওয়া হতে আবার এল। আমি তখন বারান্দার চেয়ারে বসে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছি। বুধন এসে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি স্যার। চিন্তা করবেন না। রাতে ঠিক সময়মতো ফিরে এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে যাব। বলে দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, আপনি নতুন এসেছেন, তাই একটা কথা বলছি স্যার। কিছু মনে করবেন না। সীমান্ত এলাকা তো, চোরা-কারবার-টারবার খুব হয়। সবাই সবাইকে তাই সন্দেহ করে। হুট করে কাউকে কোথায় উঠেছেন, কেন এসেছেন এসব কথা বলতে যাবেন না যেন।

বুধন চলে যেতে একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে টানটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সারারাত বাস জার্নির ফলে শরীর ক্লান্ত ছিল। কিছুক্ষণ বইয়ে চোখ বুলোতে না বুলোতেই রাজ্যের ঘুমে জড়িয়ে এল পাতা। ঘুম যখন ভাঙলো তখন অন্ধকার। বুধন এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে ডেকে তুলল। বলল, উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।

সারাটা দিন যে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব ভাবতে পারিনি। তাড়াতাড়ি উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে এসে দেখি বুধন চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। করিৎকর্মা বটে লোকটা! চা খেতে খেতে বুধনকে জিগ্যেস করলাম, মোমবাতি কেন? ইলেকট্রিসিটি নেই?

ছিল। এখন আর জ্বলে না। খারাপ হয়ে গেছে।

সেকি! তা মিস্তিরি ডেকে ঠিক করে নিলেই তো হয়।

কে করবে স্যার। এখানে তো কেউ থাকে না। অনেকদিন পর আপনি এলেন এই যা।

কেউ না আসুক তুমি তো রয়েছো। তুমিও তো ঠিক করিয়ে নিতে পার।

আমিও সব সময় এখানে থাকি না স্যার। দেশে মালদায় চলে যাই। কখনোসখনো এদিকে আসি। এই যেমন কাল আসছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাই রয়ে গেলাম এখানে। তা নইলে অন্য কোথাও ঘুরতে চলে যেতাম।

অন্য কোথাও মানে?

এই ধরুন বাংলাদেশ। কাজকর্ম তো এখন আর বিশেষ করতে হয় না তাই ঘুরে বেড়াই।

ডাকবাংলোর উল্টোদিকেই বাংলাদেশ। বারান্দায় বসে ওখানকার দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে। লোকজন যাতায়াত করছে। তবে ওরা সবাই বাংলাদেশী। এদিকের লোক তো ওদিকে যেতে পারে না। বুধনের কথা শুনে তাই হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, তুমি যখন খুশি বাংলাদেশে চলে যাও, ওরা কিছু বলে না?

না স্যার। আমায় কেউ কিছু বলে না।

সেকি! তাহলে তো ওদিক থেকেও লোকজন চলে আসতে পারে?

আসেই তো। দুবেলাই লোকজন আসে। কাস্টমস চেকপোস্ট কতক্ষণ লোকজন আটকে রাখবে। চেকপোস্ট ছাড়াও কত রাস্তা রয়েছে বেআইনী যাতায়াতের। সব জায়গায় কি পাহারা দেওয়া সম্ভব? আর আমার মতো যারা তাদের কথা তো আলাদা। বলে আবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল ও।

ওর চেহারা চালচলন কথাবার্তা সবটাই কেমন হেঁয়ালিভরা। ও নিজেই চোরাকারবারী কিনা কে জানে! তবে লোকটি যে এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, সরকারী কাজে ফাঁকি দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তা বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার।

সেদিন আর বাইরে বেরনো হলো না। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই দেখি বুধন চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কাল যে কখন চলে গিয়েছিল, আজ কখন আবার এসে উনুন ধরিয়েছে ও-ই জানে। এ সম্পর্কে ফাঁকিবাজ বুধনকে আর কিছু জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলো না আমার। দুপুরের রান্না করতে বলে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। চেকপোস্টে গিয়ে বি এস এফ-এর সঙ্গে একটু কথা বলে অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার। সকাল ছটা থেকেই খুলে যায় চেকপোস্ট। খোঁজ নিয়ে উঠে গেলাম দোতলায় ডিউটি অফিসারের সঙ্গে দেখা করব বলে।

অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আরে টোটন না?

চমকে উঠল টোটনও। কি ব্যাপার হিমু, তুই? ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়।

টোটন আমার ছোটবেলার বন্ধু। বড় হয়ে আমি চলে এলাম কাগজের লাইনে আর ও গেল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে। মাঝে বহুদিন যোগাযোগ না থাকায় ও যে এত দূরে এখানে বদলি হয়ে এসেছে জানা ছিল না।

টোটন আমাকে পেয়েই ওর এক বন্ধুকে ডিউটিতে বসিয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওর কোয়ার্টারে। তারপর ওদেরই এক সেপাইকে চা আনতে বলে একসঙ্গে ছুঁড়ে দিল এক গাদা প্রশ্ন। কখন এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় উঠেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি কবে এসেছি, কেন এসেছি সব জানিয়ে ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, ওঠার ব্যাপারটা নিয়ে তোর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। খুব ভাল জায়গাতেই উঠেছি। তোদের ওই ডাকবাংলোয়

ডাকবাংলোয়?

ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল টোটন। বলল, ডাকবাংলো কিরে? সে সব তো কবেই ভেঙেচুরে গেছে। দু একটা ঘর কোনো মতে টিকে আছে মাত্র। ওখানে কেউ ওঠে নাকি। তা ওখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কি করেছিস?

বললাম বুধনের কথা। কেয়ারটেকার বুধন মণ্ডলই রান্নাবান্না করছে। মালদা থেকে বুধনই তো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আমায়।

বুধন? চমকে যেন চিৎকার করে উঠল টোটন। কি আবোলতাবোল বকছিস। কেমন চেহারা বল তো লোকটার?

আমি ওর চেহারার বর্ণনা দিলাম। সেই সঙ্গে মালদায় দেখা হওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সবই বললাম টোটনকে। সব শুনে গুম মেরে বসে রইল ও কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে বলল, বুধন বছর দুই আগে মারা গেছে। ওই মালদাতেই। ওখানে কোথাও ওদের বাড়ি। ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। মালদা বাসস্ট্যান্ডেই একটা এক্সিডেন্টে ও মারা যায়।

এবার আমার হতভম্ব হওয়ার পালা। টোটনের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। বললাম, তা কি করে হয়। ওকে তো রান্না করতে বলে এলাম। এখন গেলেই দেখতে পাবি ও হয়তো রান্নাবান্না করছে।

আমার কথা শুনে কেমন উত্তেজিত মনে হলো টোটনকে। একটু চঞ্চলও। বলল, চল তো দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

ডাকবাংলোয় ঢুকে কারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রান্নাঘরে বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে দরজা জানলার সর্বত্র।

টোটন বললে, কি বলেছিলাম! কিছু বুঝতে পারছিস?

এবার সত্যি সত্যি ভয় করতে লাগল। টোটন আর অপেক্ষা না করে রিকশা ডেকে নিয়ে এল একটা। তক্ষুণি আমায় মালপত্র সহ টেনে নিয়ে গিয়ে তুলল ওর কোয়ার্টারে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না বুধন মণ্ডল বলে কেউ নেই। কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যে আমার সঙ্গে ছিল সে মানুষ নয়?

ছবি: রাজা সরকার

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (কার্ত্তিক সংখ্যার পর)

পেছন থেকে অপ্রত্যাশিত সাহায্য এলো!
চল.... চল.... ওদিকে চল!
হা...ম...ম্বা... হাম...ম...ম্বা...
ভৌ... ভৌ... ভৌ...
ফিরে আয় নেপোলিয়ন!
লনে তখন খুদে হিটলার বরখ্ কনরাডকে কথা বলানোর জন্যে লাফাচ্ছে।
তোকে কিভাবে কথা বলাতে হয় আমি জানি ইংরেজ শয়তান... দেখাচ্ছি তোর মজা!
ও কী!

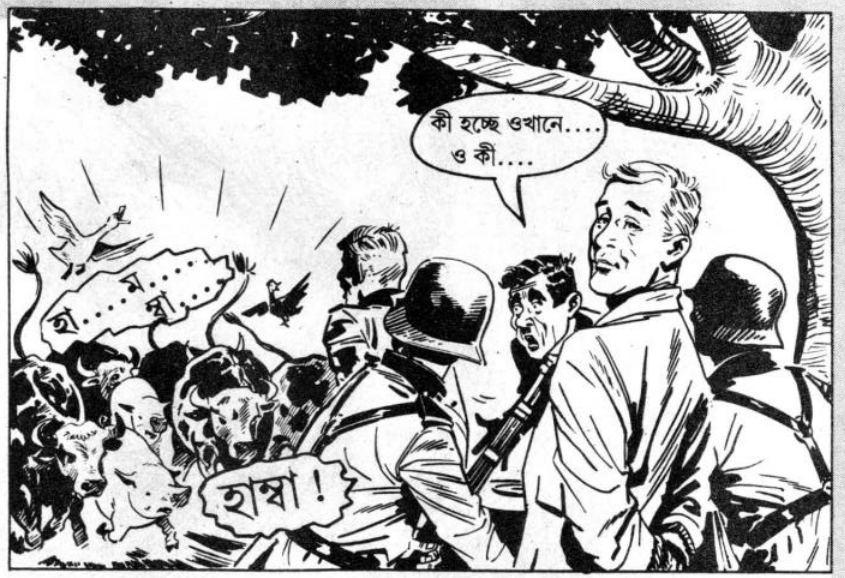
কী হচ্ছে ওখানে.... ও কী....
হা...ম...ম্বা...
হাম্বা!

সুযোগটা কাজে লাগালো কনরাড।
উঃ
সর্বনাশ পালা... পালা!
(চলবে)

অমাবস্যার রাতে

শিশিরকুমার মজুমদার

পালানপুর গাঁয়ে অল্প কিছুদিন আগে এসেছে প্রশান্ত। এসেছে সরকারী কাজে। গাঁ থেকে মাইল খানেক দূরে খাল কাটার কাজ চলছে। বহু লোক খাটছে। সেখানেই কেরানির কাজ করে প্রশান্ত। কাজের জায়গার পাশে বসে গেছে তাঁবুর শহর। কাজের লোকরা সবাই সেখানেই থাকে। প্রশান্তও থাকবে ভেবেছিল কিন্তু গোল বাধালেন তার পিসেমশাই। তাঁর সম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন এই গাঁয়ে। পিসেমশায়ের চিঠি নিয়ে বাধ্য হয়েই ও উঠেছে পালানপুরের রায়বাবুদের বাড়িতে।

বহুদিনের পুরনো এই রায়বাড়ি। এক কালে এঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, এখন আর তত ভাল নয়। জমি, জায়গা যা আছে, তাতে কোনোমতে চলে যায়।

প্রশান্ত আসাতে একতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন বাড়ির কর্তা অবনী রায়। প্রথমে তিনি প্রশান্তর কাছ থেকে কিছুই নিতে চাননি। পরে অবশ্য মাস গেলে কিছু টাকা নেন।

রায়বাড়িতে অবনী রায় ছাড়া আর আছেন তাঁর স্ত্রী পার্বতী দেবী। প্রশান্ত তাঁকে মাসিমা বলে ডাকে। অবনীবাবুর ছেলে রতনের বয়স হবে সতেরো আঠারো। সে কিছুই করে না। সারাদিন টো-টো করে বেড়ায়। ওর ছোট বোন মালতীই একা বাড়ির সব কাজ দেখাশোনা করে। সে খুব শান্ত।

সবার সঙ্গে বেশ মানিয়েই চলছিল প্রশান্ত। কিন্তু রতন যেন কেমন, প্রথম দিন থেকেই প্রশান্তকে ও যেন কেমন এড়িয়ে চলে। মুখোমুখি হলে এমন ভাব দেখায়, যেন ও কোনোদিন প্রশান্তকে দেখেইনি। একদিন কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফিরছে প্রশান্ত, হঠাৎ দেখল দূরে খালধারের নিচু জমিতে দাঁড়িয়ে রতন হাত নাড়ছে। প্রশান্ত ভাবল, রতন নিশ্চয় ওখানে কারও সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু ও জায়গাটা ভাল নয়। গাঁয়ের লোকেরা ওখানে শবদাহ করে। শ্মশান অবশ্য অনেক দূরে একটা আছে। রাতবিরেতে কেউ আর সেখানে যায় না। তারা এখানেই কাজ সারে। ওখানে রতন কার সঙ্গে কথা বলছে? কৌতূহল হলো প্রশান্তর। তাছাড়া যার সঙ্গে কথা বলছে, সে অমন করে নিচে জলের ধারেই বা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? ঐ নিচেই তো দাহ কাজ করা হয়। ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত কাছে এগিয়ে এল। বাঁক ফিরে সামনে গোটা খালটা দেখতে পেল, তার তীরে কোথাও কেউ নেই। আরও কাছে আসতে স্পষ্ট শুনতে পেল রতন বলছে, 'যাও, যাও, তুমি এখন যাও। বলেছি তো দিনের বেলা এমন করে দেখা করবে না। রাত্রিই ভাল। কি বলছ, ওই লোকটা রোজ রাতে এই পথেই ফেরে? তাতে কি, ও চলে গেলে তুমি এসো।'

থমকে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রশান্ত। ব্যাপার কি! রতন কি পাগল হলো নাকি? এমন একলা এই বিশ্রী জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব কি বলছে! রাতে তো ও নিজে ফেরে এ পথে! কাজ শেষ হলে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে তবেই ও ফেরে। তা না হলে এই অচেনা অজানা পাড়াগাঁতে ওর সময় যে কাটতেই চায় না। কিন্তু রতন এমন করে কার সঙ্গে কথা বলছে?

রাস্তার ধার থেকেই হাঁক পাড়ল প্রশান্ত, 'রতন, রতন, তুমি ওখানে কি করছ?'

ওর ডাকে সাড়া দিয়ে রতন ফিরে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল প্রশান্ত। এ কে? এ তো রতন নয়? না না, রতনই তো, কিন্তু একি তার মুখের ভাব, চোখের চাহনি! রতন বলল, 'কথা বলছি।' কিন্তু এ গলাও তো রতনের নয়। কাঁপা গলায় প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে?'

সব কটা দাঁত বার করে রতন হাসল। বীভৎস সেই হাসি। বলল, 'তাকে তুমি চেন না। তবে দেখা হবে। আজ নয়, আর একদিন।' আতঙ্কে কাঁপুনি ধরে গেল প্রশান্তর। ওই মুখ, ওই গলা আর যারই হোক না কেন, রতনের নয়। কিন্তু সামনে যে দাঁড়িয়ে সে তো রতনই। তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। কি যে করবে, প্রশান্ত ভেবেই পেল না। ওর মাথায় কিছু আসার আগেই রতন বলল, 'ভয় কি? বাড়ি চলে যাও। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। ভাল হবে না। হিঃ হিঃ হিঃ।'

প্রায় ছুটতেই শুরু করে দিল প্রশান্ত। রতন যে বদ্ধ উন্মাদ, তা তো ও শোনেনি কারও কাছে। কিন্তু আজ বিকালে এই কিছুক্ষণ আগে যা ও দেখল নিজের চোখে, তাতে তো আর সন্দেহ থাকে না যে রতন পাগল। পাগল না হলে অমন মুখের চেহারা, অমন গলা হয় কারও!

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ও নিজের ঘরে চুপ করে বসে রইল। হুঁশ হলো যখন, দেখল চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরেও কিছু আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অন্য দিন মালতী আলো দিয়ে যায়। আজ কেন যে দেরি করছে! চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে যাবে বলে যেই ঘুরেছে প্রশান্ত অমনি দেখল এক হাত দূরে সামনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রতন। কেমন করে যেন চেয়ে আছে ওর দিকে। এক অজানা ভয়ে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রশান্ত, 'তুমি, তুমি, এখানে!'

ক্লান্ত অবসন্ন গলায় রতন বলল, 'মালতী বলল, তেল ফুরিয়েছে, আজ আলো হবে না।' এ গলা যে রতনের, তাতে আর সন্দেহ রইল না প্রশান্তর। কিন্তু..... 'ওঃ, তাই নাকি!' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল প্রশান্ত, 'কিন্তু তুমি কখন এ ঘরে ঢুকলে? বুঝতেই পারিনি আমি!'

কথা শুনে মুখে কোনো ভাবান্তর এল না রতনের, বলল, 'আমি এলে কেউই বুঝতে পারে না। আমি আসি, আমি যাই, আমার যখন খুশি। হিঃ, হিঃ, হিঃ।'

সভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল প্রশান্ত, আবার সেই গলা! যে গলায় বিকালে খালধারে কথা বলেছিল রতন। পা লেগে পিছনের চেয়ারটা শব্দ করে উল্টে পড়ে গেল। তা দেখে রতন বলল, 'লাগেনি তো? আমি যাই?' আবার ওর স্বাভাবিক গলা। থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল প্রশান্ত। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে গেল রতন।

শব্দ শুনে ঘরে ঢুকল মালতী। অন্ধকারে প্রশান্তকে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি পড়ল গো প্রশান্তদা, কেমন যেন শব্দ হলো ঘরে!'

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে প্রশান্ত বলল, 'চেয়ারটা ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে। আচ্ছা, তেল নেই তো আমাকে বলনি কেন? আমি তো ক্যাম্প থেকে কিছুটা এনে দিতে পারতাম। তেলের টিনটা দাও। দেখি আমি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি নাকি।'

মালতী বলল, 'এত রাতে তোমাকে আর বার হতে হবে না প্রশান্তদা। তোমাকে বাবা ডাকছে বাইরের ঘরে। কি যেন কথা আছে। তুমি যাও, আমি তোমার চা পাঠিয়ে দেব।'

মালতী চলে যাচ্ছিল। প্রশান্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মালতী, রতন, মানে তোমার দাদার কি কখনও কোনো অসুখ করেছিল? এই ধর গলার অসুখ.....মানে....,' কথাটাকে কি ভাবে প্রশান্ত শেষ করবে তা বুঝতেই পারল না।

যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল মালতী। বলল, 'দাদার অসুখ? মানে? তুমি কি বলতে চাইছ প্রশান্তদা?'

'না মানে, ও তখন আমার সঙ্গে কথা বলল, গলাটা যেন অন্যরকম বলে মনে হলো। অস্বাভাবিক তো, তাই বলছিলাম।'

'অস্বাভাবিক!' অন্ধকারে মুখ তুলে তাকাল মালতী, 'দাদার ব্যাপারেই বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কদিন থেকে দাদার চালচলন যেন কেমন! আমরাও তা লক্ষ্য করেছি।'

মালতী আর কথা বাড়াল না। ঘর থেকে বার হয়ে গেল। একলা ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল প্রশান্ত, ও যেদিন থেকে এ বাড়িতে এসেছে, সেদিন থেকেই রতনের চালচলন অস্বাভাবিক বলে ভেবেছে। তবে তা নিয়ে বলার কিছু ছিল না ওর। কিন্তু আজ যা দেখেছে, যা শুনেছে তা খুলেই বলবে অবনীবাবুকে।

অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে বাইরের ঘরের দিকে এগোলো প্রশান্ত। সব কথা খোলাখুলি অবনীবাবুকে বলাই ভাল। তাতে অন্তত তিনি তাঁর ছেলের সম্বন্ধে যা করার তা করতে পারবেন। প্রশান্তর নিজের ধারণা রতনকে এখুনি ডাক্তার দেখান উচিত। তা না হলে হয়তো ও একেবারে পাগল হয়ে যেতে পারে।

বারান্দায় আর এক পা এগোতেই প্রশান্তর মনে হলো, সামনে যেন কিসের এক বাধা। কিছুই কোথাও নেই অথচ ও এগোতে পারছে না। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে পাশের জানালার কপাটটা আছড়ে খুলে গেল। বারান্দার মধ্যে হাওয়ার একটা ঘূর্ণি উঠল। তার ধাক্কায় পাক খেতে খেতে দেওয়ালে টাঙান আয়না, লক্ষ্মীর ছবি দেওয়াল থেকে খুলে ওর চারপাশে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। দেওয়ালের ধারে রাখা ভারী ঘড়াটা কাত হয়ে পড়ে গবগব করে জল পড়তে লাগল। তারপর আচমকাই ঘূর্ণি থেমে গেল। পাশের ঘর থেকে অবনীবাবুর স্ত্রী ছুটে এলেন। ছুটে এলো মালতী। সামনে সব কিছু অমন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে দুজনেই অবাক। 'কি হলো, কি হলো?' বলে চিৎকার করতে করতে বাইরের ঘর থেকে অবনীবাবুও এসে পড়লেন। চারদিক দেখে উনি বললেন, 'এ কি! এমন হলো কি করে?'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না প্রশান্ত। বলল, 'হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় পাশের জানালাটা খুলে গিয়েই এমন বিপত্তি ঘটেছে। হাওয়াটার খুব জোর ছিল!'

কেমন এক অবিশ্বাসের গলায় অবনীবাবু বললেন, 'ও জানালাটা গত কুড়ি বাইশ বছর বোধহয় খোলা হয়নি। ধাক্কা দিয়েও তো আমরা কেউই ওটা খুলতে পারিনি। আজ হাওয়ায় খুলে গেল! আচ্ছা রতনের মা, রতন কোথায়? এত কাণ্ড ঘটল বাড়িতে, সে এল না।'

ব্যস্ত হয়ে প্রশান্ত বলল, 'সে তো এই মাত্র এখানে ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলল।'

মালতী বলল, 'তোমার ঘর থেকে বার হয়ে দাদাকে আমি বাইরে যেতে দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ এত অন্ধকারে, তো জবাব দিল না।'

'এ এক ছেলে হয়েছে বটে।' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন অবনীবাবু, 'নাও, তোমরা আর দাঁড়িয়ে থেকো না, মোমবাতি জালো, জ্বেলে বারান্দাটা সাফ করে ফেল। প্রশান্ত, তোমার তো এখন কোনো কাজ নেই, এসো তো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

বাইরের ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল মালতী। ওরা পাতা ফরাসের উপর বসল। উঁচু চৌকি। সেকেলে ভারী জিনিস। তার উপরেই শতরঞ্জি আর চাদর পাতা। অবনীবাবু বললেন, 'একটু চা কর তো মালতী। মন-মেজাজ একদম ভাল নেই আমার, বুঝলে প্রশান্ত।'

মালতী বলল, 'দাদা কিন্তু চায় না বাবা, তুমি প্রশান্তদার সঙ্গে ওর বিষয় নিয়ে আলোচনা কর।'

অবাক অবনীবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে তোকে একথা বলেছে? কিন্তু ও জানল কি করে আমি ওর সম্বন্ধে প্রশান্তর সঙ্গে আলোচনা করব!'

'তা তো জানি না বাবা, গত কাল রাতে, প্রশান্তদার ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, দেরি হবার কথা প্রশান্তদা বলে গেছে কি না? দাদা তখন সেখানে ছিল না। কিন্তু তখুনি ফিরল। দেখেই মনে হলো বেশ রেগে আছে কারও উপরে। আমরা কিছু বলার আগেই ও মাকে বলল, তোমরা ওই নতুন লোকটাকে বলে দিও রোজ রাতে যেন এত দেরি করে না ফেরে। আর যদি দেরিই করে তো খালপাড়ের পথ ধরে যেন না আসে। আমার অসুবিধা হয়।'

মা বলল, 'খালপাড়ের পথ দিয়ে লোক চলাচল করবে তাতে তোর অসুবিধা কিসে শুনি।'

তখুনি দাদা বলল, 'জানি, জানি, আমার সম্বন্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করছ তোমরা। বাবাকে বলে দিও, আমার সম্বন্ধে ওই লোকটার সঙ্গে কথা বললে আমি বরদাস্ত করব না। ও কে? ও কেন এ বাড়িতে থাকবে? ও কেন বাড়ির ব্যাপারে নাক গলাবে?'

ঘরের কারও মুখে অনেকক্ষণ কোনো কথা ছিল না। অবনীবাবু বললেন, 'তোরা নিশ্চয়ই কেউ ওকে কিছু বলেছিস। তা না হলে ও এসব কথা বলে কি করে?'

মালতী বলল, 'না না, আমরা দাদাকে কখনও কিছু বলিনি। তবে সেদিন তো তোমার আমার সামনে মা ওকে বকেছিল, বলেছিল, খোকা তোর চালচলন আমার ভাল লাগছে না, মাথা খারাপ হলো নাকি তোর? সেই সেদিন থেকেই দাদা যেন কেমন হয়ে গেছে।'

একথা শুনে অবনীবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মালতী বলল, 'ঘরে যে কেরোসিন তেল নেই তা তো আমরা কেউই ওকে বলিনি। কোথায় ছিল যেন দাদা, হঠাৎ এই কিছুক্ষণ আগে ঘরে ঢুকে আমাকে বলল, তোকে যেতে হবে না, আমিই লোকটাকে বলে আসছি, তেল নেই আলো জ্বলবে না। আমি কিছু বলার আগেই দাদা প্রশান্তদার ঘরে ঢুকে গেছিল।'

'তুই যা, দুকাপ চা নিয়ে আয়। আমরা আলোচনা করে দেখি, কি যে হলো ওর।'

মালতী চলে গেল। অবনীবাবু কিছুক্ষণ মোমবাতির শিখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'ছেলেটা এমন ছিল না, বুঝলে প্রশান্ত, লেখাপড়া করত স্কুলে যেত। আমার ছোটভাই ধরণী, এই বছর দেড়েক হলো মারা গেছে, তার খুব ন্যাওটা ছিল। কাকা-ভাইপোর ভাব দেখার মতো। ধরণীই ওর পড়াশুনা দেখত, কাছে কাছে রাখত। সে গেল, আর ছেলেটাও যেন দিনকে দিন কেমন হয়ে উঠতে লাগল। সব প্রথমে সে স্কুল ছাড়ল, পড়াশুনা ছাড়ল। এখন তো কোথায় যায়, কি করে, কেউই বলতে পারে না। একেবারে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। তার ওপর কদিন থেকে ওর অন্য একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করছি আমি। তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, তবে, তবে.....'

যা বলতে যাচ্ছিলেন অবনীবাবু, তা আর বলা হলো না। ভিতর

বাড়ি থেকে মালতীর আতঙ্কমাখা আর্তনাদ ভেসে এল। চমকে উঠে দুজনেই চৌকি থেকে নেমে ছুটলেন ভিতর বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে। চিৎকারটা সেখান থেকেই এসেছে। ছুটতে ছুটতে প্রশান্ত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মালতী, মালতী, কি হয়েছে। কোনো ভয় নেই, আমরা আসছি।'

ধাক্কা দিয়ে রান্নাঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে ফেলল প্রশান্ত। উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মালতী সামনের জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে আতঙ্কে। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কুলুঙ্গীর মোমের আলোয় স্পষ্ট দেখল প্রশান্ত পাশের ঐ খোলা জানালাটার সামনে থেকে একটা মুখ সরে গেল। এ সেই মুখ যে মুখের ছায়া ও দেখেছিল রতনের মুখে, বিকালে খালধারে! 'কে, কে ওখানে?' ও কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। আস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রতন। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল, 'আমি। আমি চাই না, তোমরা আমার বিষয়ে কিছু আলোচনা কর। বার বার বলছি শুনছ না, বিপদ হবে।'

ভীষণ রাগে অবনীবাবু বললেন, 'তোর লজ্জা করে না, ছোট বোনকে এমন করে ভয় দেখাতে। তুই কি?'

রতন কেমন করে যেন তাকাল অবনীবাবুর দিকে। বলল, 'ভয়? ভয় আমি দেখাইনি। আমি না, আমি না।'

মাসিমা বললেন, 'অনেক হয়েছে। তোমরা সরো, মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাই এখান থেকে। আয় মালু, আয়, আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে কিছুক্ষণ বসবি চল। বাড়িতে তেল ফুরিয়েছে, সেদিকে যদি কারও খেয়াল থাকে। অমাবস্যার রাত, সারা বাড়িতে আলো নেই। খোকা, তোরও আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। অনেক হয়েছে। এখন দুদণ্ড স্থির হয়ে বোস তো।'

মালতীকে উনি জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রতন বলল, 'আমিও যাই।' কথার শেষে ও আবার বাইরের দিকে এগোচ্ছিল। ওকে বাধা দিয়ে অবনীবাবু বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই এত রাতে? শুনলি না আজ অমাবস্যা, গরম কাল, সাপখোপের গায়েও তো পা পড়তে পারে। বাঁচবি তা হলে?'

'ওরা আমাকে ভয় পায়।' বলল রতন, 'যেমন মালু ভয় পেল।'

'কি বলছিস তুই?' ধমকে উঠলেন অবনীবাবু, 'তোর দেখছি মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে। ডাক্তারই ডাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

একথা শুনে হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল রতন। ফিরে তাকাল ওদের দিকে। ভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল প্রশান্ত, এ তো সেই ভয়ঙ্কর মুখ। কি বীভৎস ভাবেই না তাকিয়ে আছে। দাঁত বার করে রতন আবার হাসল। বলল, 'কোন ডাক্তারকে ডাকবে? চড়কডাঙার বরদা ডাক্তারকে? ডাকো? তাকেও তো চাই।' আবার সেই ভয়ঙ্কর গলা!

'কি বলছ তুমি,' ভীষণ দুঃসাহসে প্রশান্ত বলল, 'এ তোমার কি হয়েছে? কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন তুমি?'

তুই এখানে কেন?

'তবে রে', বলে থপ থপ করে এগিয়ে এল রতন, চোখ দুটোতে যেন আগুন জ্বলছে ওর, বলল, 'তুই এখানে কেন? কেন? কেন?'

কি যে হলো প্রশান্ত বুঝতেই পারল না। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল উঠোনের এক পাশে। মনে হলো বুকের খানকয় পাঁজরা বুঝি ওর ভেঙে গেল। যন্ত্রণা চেপে কোনো মতে ও উঠে বসল। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তার মধ্যেই ও শুনল রতন বলছে, 'বরদা ডাক্তারকে ডাকো, গুণেন নায়েবকে ডাকো, আর ওই যে সেই লোকটা, যে কাপড়ে মুখ ঢেকে চলত, তাকেও ডাকো। তবেই না আমি ভাল হব। তার আগে আমার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না বলে দিলাম। ভাল হবে না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে থপ থপ করতে করতে ও বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বহুকষ্টে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। না, যত ব্যথাই লাগুক না কেন পাঁজরা ভাঙেনি ওর। কিন্তু এসব কি হচ্ছে আজ! রতনের কথাগুলো একেবারে পাগলের মতো। কিন্তু সে সব কথা শুনে অবনীবাবু অমন থমকে গেলেন কেন? তবে কি এ সবের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে যা রতন জানে। জানে, কিন্তু তা গোপন রাখার চেষ্টায় অমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে? তাহলে তো রতনকে এখুনি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। একথা মনে রেখেই ও বলল, 'চলুন মেসোমশাই, আমরা গিয়ে আবার বাইরের ঘরে বসি। রতন সম্বন্ধে এখুনি কিছু ভেবে ঠিক করা উচিত। দেরি করলে ওর চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।'

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে অবনীবাবু বললেন, 'আমি তো কিছুই বুঝছি না প্রশান্ত। ও আমাদের মনের কথা আগেই বুঝতে পারছে কি করে। শুনলে না বার বার বলছে, আমার সম্বন্ধে আলোচনা করলে বিপদ হবে। তুমি বাবা বাইরের ছেলে, তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না। আলোচনা থাক। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।'

অবাক প্রশান্ত বলল, 'এ কি বলছেন আপনি? কোনো কারণে মানসিক ভারসাম্য হারালে মানুষ অনেক কিছু অদ্ভুত কাণ্ড করে, তাদের তাড়াতাড়ি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান উচিত। ভাল হয়ে যাবে

তাতেই। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে না!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। আমার ভীষণ ভয় করছে।' কাতরভাবে বললেন অবনীবাবু।

ওঁকে ধরে নিয়ে বাইরের ঘরে বসাল প্রশান্ত। মোমবাতিটা সামনে এনে ডেস্কের উপরে রাখল। বলল, 'আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব ওর সম্বন্ধে, আমার মনেও কিছু খটকা আছে।'

'কি তুমি জানতে চাও বাবা?' কাতর ভাবে বললেন অবনীবাবু।

'কাজের জায়গা থেকে আমাকে ফিরতে হয় খালপাড় দিয়ে, ওখানেই শুনেছি গাঁয়ের লোকরা রাতে শবদাহ করে। ওখানে কি এবাড়ির কাউকে দাহ করা হয়েছিল?'

চমকে উঠলেন অবনীবাবু। বললেন, 'ওখানেই তো ক'বছর আগে আমার ছোটভাইকে দাহ করা হয়েছিল। সেদিন দুর্যোগ ছিল। সন্ধ্যা রাতে ও মারা যায়। দূর শ্মশানে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। বাগানের দুটো গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। সে কাঠেই তাকে দাহ করা হয়।' করুণ মুখ করে অবনীবাবু প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু বাবা, একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'সব কথা এখন আপনার জানাই উচিত। ওখানে ওই শ্মশানের ধারে আমি রতনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বিকালে। কারও সঙ্গে ও কথা বলছিল। তাকে বলছিল, দিনে না আসতে, রাতের অন্ধকারে আসতে। আমি কাজের জায়গা থেকে ও পথ দিয়ে ফিরে আসার পর।' কিছুক্ষণ থামল প্রশান্ত, তারপর ইতস্তত করে বলল, 'আমি ভাল করে দেখেছি, কথা বলার মতো কেউ কোথাও ছিল না তখন।'

কপাল চাপড়ালেন অবনীবাবু। মুখে কিছুই বললেন না। প্রশান্ত ভাল করে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। চড়কডাঙার বরদা ডাক্তার কে? সে কথা বলবেন কি?'

প্রায় কেঁদেই ফেললেন অবনীবাবু। কপাল চাপড়ে বললেন, 'সম্পত্তি অনর্থের মূল, জান তো বাবা। নেই নেই করেও আমাদের কিছু জমি-জায়গা আছে। আমরা দুভাই ছিলাম সেই সম্পত্তির মালিক। প্রমাণ দিতে পারব না, আমার মনে কোনো পাপ ছিল না। আমি জানি, আমার ভাইও আমাকে কোনো সন্দেহ করত না। আমার ছেলেকে তো সে প্রাণের অধিক ভালবাসত। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল মধুর। সত্যি বলতে কি আমি তো ওর বিয়ের জন্য খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, ও পড়ল কাল অসুখে। বরদাবাবু আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার, আমি তাঁকেই ডেকেছিলাম। তিনিও বোঝেননি যে রোগটা অত ভয়ঙ্কর। ফলে যা হবার তাই হলো। চারদিকে কানাঘুষা রটল, আমি নাকি আমার ভাইকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলেছি। সে যে আমার কি ভয়ানক অবস্থা! থানা পুলিশ হলো না, কারণ, বরদা ডাক্তার চড়কডাঙার অন্য আরও কজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আসলে ওর রোগটা যে কি তা ওঁরা কেউই ঠিক ধরতে পারেননি। থানা পুলিশ না হলেও লোকের মনের সন্দেহ তো যাবার নয়। সে কারণে আমাকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল।' থামলেন অবনীবাবু।

প্রশান্ত বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আরও একটা প্রশ্ন আছে আমার, গুণেন নায়েব কে? কে ওই কাপড়ে মুখ ঢাকা লোক, যার কথা তখন রতন বলল।'

থমকে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন অবনীবাবু। শেষে বললেন, 'গুণেন এ বাড়িতে নায়েবী করত। আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সে আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে সুযোগ নেবার চেষ্টায় ছিল। সে-ই আশপাশ সবার কাছে আমার নামে কুৎসা রটাতে থাকে। আসলে সে ভেবেছিল আমি টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করব। তা যখন করলাম না, তখন সে কোথা থেকে একটা লোককে কাজে লাগাল, সে নাকি মুখে সাদা কাপড় ঢেকে ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে। গুণেন রটাল, ওই লোকটাকে দিয়েই আমি নাকি আমার ভাইয়ের দেহ গোপনে সৎকার করিয়েছি। বলেছি না, ওর মৃত্যুর দিন ভীষণ দুর্যোগ ছিল। তাই এমন কথা রটাতে ও সাহস পেয়েছিল। তবে সঙ্গে আমার অন্য আত্মীয়-স্বজন থাকাতে ওর এই রটনাতে আমি বিচলিত হইনি।'

প্রশান্ত তবুও জিজ্ঞাসা করল, 'রতনও তো এসব কথা জানে?'

'না, তা নয়।' বললেন অবনীবাবু, 'ভাইয়ের রোগের বাড়াবাড়ি দেখে মালু আর রতনকে আমি পাশের গাঁয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি রেখে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম মামাবাড়িতে ওরা ভালই থাকবে। তা ওরা ভালই ছিল। কিন্তু ফিরে এসে রতন যেন কেমন হয়ে গেল। আসলে কি জান, কাকাকে ও ভীষণ ভালবাসত। সেই কাকার মৃত্যু সম্বন্ধে আজেবাজে কানাঘুষা শুনে শুনে ও আর মাথার ঠিক রাখতে পারল না। সেই থেকেই ও যেন কেমন হয়ে গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের চুপ করলেন অবনীবাবু।

প্রশান্তর মনে হলো, কোথায় যেন একটা গোপন রহস্য আছে। অবনীবাবুর ভাইয়ের মৃত্যুতে নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে। অবনীবাবু তাঁর নিজের কথা বললেন। কিন্তু রতন তো একেবারে ছেলেমানুষ নয়। পনের ষোল বছর তো নিশ্চয়ই হবে ওর। সে কি কিছু সন্দেহ করেছে? বাবার বিরুদ্ধে সেই সন্দেহ মনে চেপে রেখে রেখেই আজ ওর এই চরম মানসিক বিপর্যয়। সরকারি কাজ করতে এসে একি বিশ্রী ব্যাপারে ও জড়িয়ে পড়ল। এখনও সময় আছে, অনায়াসেই ও চলে যেতে পারে যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানকার ক্যাম্পে। তাই কি যাবে ও?

আর কিছু ভাবতে পারল না প্রশান্ত। বাইরের বাগানে একটা বিশ্রী শব্দ উঠল। কেউ যেন কাউকে প্রচণ্ড ভাবে মারছে, তার সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ। তারপরই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। গাছের ডালপালা আছাড়িপিছাড়ি খেতে লাগল। ঘরের দরজা জানালা আছড়ে পড়ল, মোমবাতিটা নিভে গেল। ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। অবনীবাবু অন্ধকারের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে, কে ওখানে অমন ভাবে চেঁচাল?'

[চলবে]

ছবি: বিজন কর্মকার

নতুন ধাঁধা

১। তিন অক্ষরের নামটি তার
উড়ে বেড়ায় আকাশে
শেষে দুটি দিলে বাদ
প্রথমটি যায় পথে পথে।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
দুর্গাপুর

২। তিন মিলে গঠন তার
মিলবে এখানে সেখানে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
পাবে শুধুই রাজস্থানে।

—বিজন দেব
ধর্মনগর, ত্রিপুরা

৩। ভালো-মন্দ প্রহার দিয়ে
শেষে দিলাম রায়
মন কেড়েছেন যিনি মোদের
গুণের প্রতিভায়।

—কল্লোল ও মৌসুমী
মনোহর, বাঁকুড়া

৪। শুরু শেষ বৎস
মাথা কাটা শস্য
সবে বাদ দিলে
উত্তরটা পেলে।

—মনোজ মণ্ডল
খুড়িয়াম, দুমকা

কার্তিক সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ ১। গমন ২। দাঁত ৩। পালকী ৪। ফকির

কার্তিক সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১। রতন ৩। কিরাত ৬। মরু ৮। সম ৯। আকয় ১১। ধ্বজা ১২। জয়া ১৪। নরক ১৭। রত ১৯। ব্রত ২০। জলসা ২১। ভুজঙ্গ

ওপর-নিচঃ

১। রমণী ২। তরু ৪। রাস ৫। তমসা ৭। বক ৯। আজান ১০। রজক ১৩। বরজ ১৫। রতি ১৬। পতঙ্গ ১৮। তল ১৯। ব্রজ

বলো তো আমি কে?

সূত্র হেঁয়ালি

বিখ্যাত এক গল্পের নায়ক আমি। আমাকে চিনতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখঃ

সূত্র একঃ মিসিসিপি নদীর তীরে একটা ছোট্ট শহরে আমি থাকতাম আমার মাসীর সঙ্গে।

সূত্র দুইঃ আমি ছিলাম অসম্ভব ডানপিটে। বাড়িতে ও স্কুলে সবাইকে জ্বালাতন করে কী আনন্দই যে পেতাম! কিন্তু মাসীকে আমি ভয় করতাম খুব।

সূত্র তিনঃ একবার মাঝরাতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি কবরখানায় যাই। সেখানে একজনকে খুন হতে দেখি।

সূত্র চারঃ আর একবার মনের দুঃখে আমি ও আমার প্রাণের বন্ধু বাড়ি থেকে পালাই। মতলব ছিল জলদস্যু হব। কিন্তু বাড়ির সকলের জন্য মন কেমন করল বলে ফিরে আসি।

সূত্র পাঁচঃ প্রচণ্ড ভয় করলেও কবরখানার খুনের সাক্ষী আমি দিতে যাই আর আসল খুনী কে তা বলেও ফেলি।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমায় চিনতে পারো তাহলে বলবো অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে পারলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র খুব ভালো; চতুর্থ সূত্র ভালো; আর পঞ্চম সূত্র থেকে পারলে মোটামুটি। যদি না পারো তবে আমার নাম পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালা

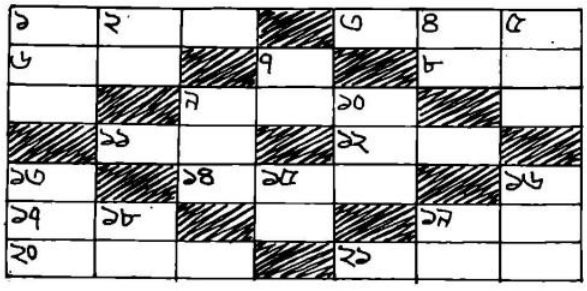

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭	■	৮	
	■	৯		১০	■	
■	১১		■	১২		■
১৩	■	১৪	১৫		■	১৬
১৭	১৮	■		■	১৯	
২০			■	২১		

এটি তৈরি করেছেন ঝন্‌ঝা ভট্টাচার্য, তাজপুর, অসম

সূত্র □

পাশাপাশিঃ

১। শিবের সাথে চৈত্রমাসে/অধিক সন্ন্যাসীতে কর্মনাশে
৩। উঠে এই রেলে/সীতার খবর পেলে?
৬। ওজন নয়/হৃদয়ে রয়
৮। সভাপতি হলে/জুটবে তোমার গলে
৯। আমের দেশে চলে যাও/গণিবাবুকে সাথে নাও
১১। গলে গলে জ্বলে/লোডশেডিং হলে
১২। দুধ নয়, ছানা নয়/নিমন্ত্রিতের পাতে রয়
১৪। খিচুড়ির সাথে/ভাল হয় পেলে পাতে
১৭। উল্টে দিলে জব্দ হবে/সোজা থাকলে মৃত বলবে
১৯। লম্বা লাঠি, মাথায় বাটি/না থাকলে রান্না মাটি
২০। সোজা নয় বাঁকা নয়/উঁচু নিচু মিলে রয়
২১। কিলো নয় গ্রাম নয়/তরল বস্তুর মাপ হয়।

উপর-নিচঃ

১। স্নানের সময় সঙ্গে নাও/অঙ্গে চেপে জল শুখাও
২। এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে/লোক গণনায় হিসাব মেলে
৪। পিতল নয় কাঁসা নয়/তিনটি ধাতুর একটি হয়
৫। বিধাতার লিখন/খণ্ডাবে কোন জন?
৭। ফল পাকলে কাকের কি?/শিবের মাথায় দেবে কি?
৯। বিচার যদি চাও/আদালতে যাও
১০। তবলায় চাঁটি মার/কাহারবা নয়—ধর
১৩। যুবক নয়, বৃদ্ধও নয়/জীবনের শুরুতে রয়
১৫। ভিন্ন অর্থে শক্তি হয়/খেলার সময় পায়ে রয়
১৬। তারে তারে ঝংকার/রবিশংকর নাম তাঁর
১৮। আত্মীয় সে নয়/সখা তারে কয়
১৯। চন্দ্রবিন্দু মাথায় দিলে/আছাড় খাবে শিখতে গেলে

অনুবাদ সিরিজ

মার্ক টোয়েন

অ্যাডভেঞ্চার অব টম সইয়ার

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

পুঁটি, পদ্ম, মম, কুণাল ও মৃণাল চক্রবর্তী/এল-২, কোল ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্স, বাঘা যতীন; বাবা, মা, পূবালী ও শৌভিক বসু/ষষ্ঠীতলা; বীণা, সোমা ও বুবাই/সিমলা রোড; রূপা, টুম্পা, ইন্দু ও পাপান/নর্থ নারকেলডাঙ্গা; সুইটি, বিউটি, সানি ও আমিন/তালতলা; অর্জুন ও অরুণ মিত্র/বাঙ্গুর;

॥ হাওড়া ॥

প্রদীপ, অপর্ণা, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; সৃজন, বিদ্যুৎ ও রীনা নাথ/অবিনাশ ব্যানার্জী লেন; সৌম, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/অনন্তদেব মুখার্জী লেন, শিবপুর;

॥ হুগলী ॥

সুদীপ্ত, শুভ্র, সংঘমিত্রা, সুরূপা ও সুমন পালিত/চোপা; স্বাতী ব্যানার্জী/জমিদার রোড, শেওড়াফুলী;

॥ বাঁকুড়া ॥

শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলু ও রাজু/লোকপুর; মিলটন, কল্লোল, বুবাই, মৌসুমী, অষ্টমী, পার্থ, বৈশাখী ও টুসি/মনোহর; মীনা, ইন্দ্রনীল রায়, মণিকা খাঁ, পায়েল ও বাবু মজুমদার/মেজিয়া; শ্রাবণী, ঝুমা, ভোলা, লালু, মিতুল ও দোয়েল/মেজিয়া, কায়স্থপাড়া; জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও নটুবিহারী রুইদাস/অর্ধগ্রাম; অনীতা, মিনতি, স্মিতা, সিদ্ধার্থ, ফাল্গুনী ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়/অর্ধগ্রাম;

॥ বর্ধমান ॥

শ্যামল, বরণী ও শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাস/নিউ কলোনি, কুলটি; মায়া, বাপ্পা ও রুমা মণ্ডল/রানীগঞ্জ; বাপ্পা, বাবলি, সাবিত্রী, শক্তি, ডলি, শমীক, সীমা ও পৌলমী শর্মা/চিত্তরঞ্জন; শিল্পী, পৌলমী ও পাপু মিত্র/ছোটনীলপুর; তিমিরজ্যোতি, মল্লিকা, অনন্যা, গৌতম, দেবজ্যোতি, মঞ্জরী ও তারাশঙ্করী/কেঁদুড়;

বলো তো আমি কে-এর উত্তরঃ

আমি টম সইয়ার। মার্ক টোয়েন-এর লেখা 'অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সইয়ার' গল্পের নায়ক আমি।

॥ ২৪ পরগনা ॥

সোমনাথ ভট্টাচার্য, জয়জিৎ বসু, সুশীল শ্রীবাস্তব, অপর্ণা নন্দী, মলয় ও দীনেশরঞ্জন কর/নবজীবন কলোনি, বিশরপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা; চম্পা, ঝর্ণা, রিপন, পরশ, রাহুল, মামণি, বুলটি ও পলাশ/সিঁথিপাড়া, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা; পলাশ, নিবেদিতা, পরাগ, পল্লব, বন্দনা ও ব্রততী বৈদ্য/ কাশীনগর;

॥ পুরুলিয়া ॥

কৌশিক, যীশু, সুস্নেতা ও বৈশাখী চৌধুরী/এস. সি. মেন রোড,

॥ নদীয়া ॥

মৃণাল, মৃন্ময় ও মৃদুলকান্তি বিশ্বাস/নুড়িপাড়া, কৃষ্ণনগর;

॥ বিহার ॥

প্রিয়নাথ ও শুভ্রা মাজি/কর্মিকনগর কলোনি, ধানবাদ;

আষাঢ় সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

সুধাময়, শ্যামলী ও ডায়না বসু/বৃন্দাবন ঘোষ লেন; শতাক্ষী, শবরী ও রাখী/নবপল্লী, বাগুইহাটি; দেবদীপ সেন/ব্রড স্ট্রিট; সুইটি, বিউটি, সানি ও আমিন/তালতলা; পূবালী ও সৌভিক বসু/ষষ্ঠিতলা; পাপুন, মিঠুন ও দিয়া/নন্দনা পার্ক, বেহালা; শুভমিতা মজুমদার/দমদম;

॥ হাওড়া ॥

নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশ দত্ত/বারুইপাড়া, ডোমজুড়; সুদীপ ও কাকলী/বি গার্ডেন, শিবপুর; বাবুন, ফুচি, বোনা ও পাপাই/দানু বোস লেন; অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা ও অরিন্দম/সদর বক্সী লেন; প্রদীপকুমার, আকাশকুমার ও বিজলী সরকার/দানু বোস লেন; পুলক মজুমদার ও নির্মলেন্দু ঘোষ/পঞ্চাননতলা রোড; পাপা, বুড়ি, কৃষ্ণা, লালটু, সোমা, খোকন ও খুকু/নরসিংদত্ত রোড, কদমতলা; লীনা, রিমা, পিয়ালী, সোনালী ও শুভদীপ/কদমতলা; অনামিকা, অনিতা, শর্মিলা, রঞ্জনা ও রাজু/ফকির দাস মণ্ডল লেন; শুভদীপ ও রূপপর্ণা মুখার্জী/আন্দুল দক্ষিণপাড়া; হীরালাল, রুমা ও পাপাই ব্যানার্জী/বলুহাটি; রঞ্জন বসু/সাতকড়ি চাটার্জী লেন; সৌরভ, সম্রাট ও প্রণব মণ্ডল/তেঁতুলকুলী;

॥ হুগলী ॥

দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/শ্রীরামপুর;

॥ বর্ধমান ॥

ঋষি, সামু, শ্রী, সু ও বুয়ান/খালুইবিল; অজিতকুমার ঘোষ/আসানসোল;

॥ মেদিনীপুর ॥

দেউরিবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ/শুকরুল্লাপুর; শ্রীধর, সৌরভ, শিবানী ও সৌলমী সামন্ত/কাখুরিয়াবাড়ি; সন্তু, তনু ও সোমু/আস্তাড়া; গোরা ও শ্রীল/কোলাঘাট;

॥ ২৪পরগনা ॥

সমীরকুমার ও সুবলকুমার ঘোষ/নাইয়াপাড়া, ডায়মণ্ড হারবার; রিয়ান, রাহুল, পরশ, মামণি, চম্পা, ঝর্ণা, বুল্টি ও পলাশ/সিঁথিবাড়া, বারাসাত;

॥ বিহার ॥

অনির্বাণ ও দেবানিকা ভট্টাচার্য/শ্যামলী কলোনি, রাঁচী; ঋতুপর্ণা ও শ্রেয়পর্ণা মুখার্জী/কাতরাসগড়, ধানবাদ।

ফুটকি থেকে ফুটকি

হাঙ্গরের মুখ থেকে কে পালাতে চাইছে?

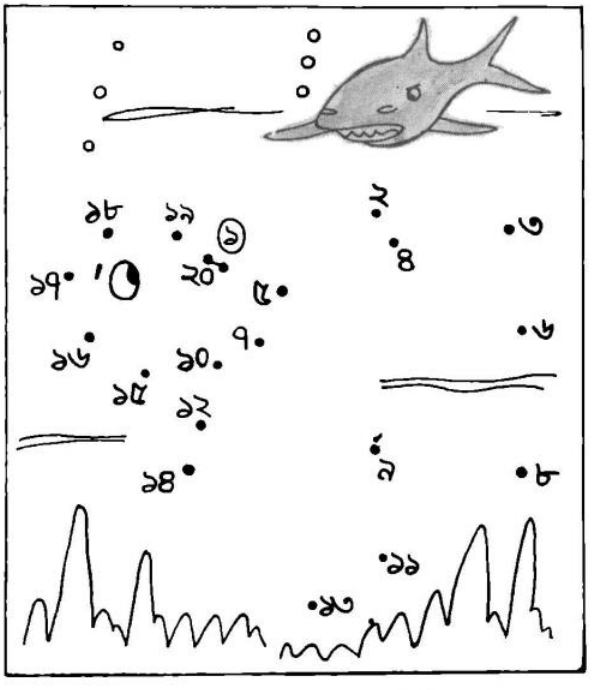

ছোট-বড় সকলের ভালোলাগার মতো দারুণ চারটি বই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ২২.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বই মানেই রহস্য, রোমাঞ্চ আর মজা। তারই পরিচয় মিলবে লেখকের নিজের বাছা এই শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনের পাতায় পাতায়।

গৌরী দের

রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২০.০০

গা ছমছম করা সব ভূতের গল্প। শিহরন জাগানো প্রত্যেকটি গল্পেই ভয় আর ভালোলাগা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

সুকুমার ভট্টাচার্যর

মৃত্যুর মুখ থেকে ১২.০০

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার দুরন্ত সব সত্য ঘটনা।

ভিক্ষু বুদ্ধদেবের

বুড়োর শুধু খাই খাই ৭.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১ ঝামাপুকুর লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একাগ্রমনে চিন্তা করতে থাকে টারজান কেন সে ভুলে গেল মিচেলস-এর উপস্থিতি। হঠাৎ আঁধার ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলে উঠলে যেমন হয়, টারজানের বিস্মৃতি-বিকল মস্তিষ্কে ঝলসে উঠল সেই কারণটা। লকেট! সেই লকেটটা! মিচেলস-এর কাছ থেকে যা সে কেড়ে নিয়েছিল 'আমার লকেট' বলে। 'আমার', তার মানে লেডী জেন-এর। খামার লুঠ করতে গিয়ে লেডী জেনকে ওরা হত্যা করল যখন, লকেটটা খুলে নিয়েছিল পাপিষ্ঠ মুয়েরবার্নক।

ধাঁধার উপরে পুনশ্চ ধাঁধা। মুয়েরবার্নক নাকি দুটো? একটা মেজর, অন্যটা কাপ্তেন। মিচেলস-এর কথা থেকে তো মনে হলো একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসেছে টারজান। জেন-এর হত্যাকারী মনে করে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করে বসে আছে 'মেজর' মুয়েরবার্নককে, এদিকে আজ মিচেলস প্রকাশ করল যে হত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ সেদিন যা-কিছু হয়েছিল টারজানের খামারে, তার সবকিছুর জন্যই দায়ী 'কাপ্তেন' মুয়েরবার্নক। কাপ্তেন, মেজর নয়। সাংঘাতিক! মারাত্মক ভুল! মেজর মুয়েরবার্নক নাকি ওয়াজিরিস্তানে যাইনি মোটে। গিয়েছিল কাপ্তেন মুয়েরবার্নক, সবকিছু অত্যাচারের জন্য দায়ী ঐ কাপ্তেনটা। তাকে তার পাপের দণ্ড তো দিতে হয় অবিলম্বে।

কিন্তু কাজটা শুরু হবে কী ভাবে? জার্মান শিবিরে নেই সেই নরাধম কাপ্তেন। থাকলে আন্দ্রেকরের অফিসে সেই রাত্রে তার আঁচ পেতো টারজান। তাহলে সম্ভবতঃ নিউকার্ডিফের সেনানিবাসে থাকতে পারে। মিচেলস এই মহারণ্যের ভিতর দিয়ে যে পথ ধরে চলেছিল, সেও তো সেই নিউকার্ডিফেরই পথ। নিশ্চয়ই মিচেলস-এর আশু প্রয়োজন সেই কাপ্তেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

হুঁ, যোগাযোগ অনেক দিনের, ঐ দুটিতে। প্রকৃতিটাও দুজনের এক। সুযোগ পেয়েই কাপ্তেনমশাই হত্যা করলেন নিরপরাধ ওয়াজিরিদের। আর সুযোগ পেয়েই প্রাণদাতা টারজানের মাথায় পিস্তলের ঘা বসিয়ে দিলেন এই গুপ্তচর মিচেলস। একই হিংস্র মনোবৃত্তি।

মিচেলস-এর কথা যদি সত্য হয়, লকেটটা সে পেয়েছিল কাপ্তেনের কাছে। 'গচ্ছিত' কথাটাই বোধ হয় ব্যবহার করেছিল মিচেলস। কাজকারবারে লেনদেন আছে ওদের, তা বোঝা সহজ। লকেটটা টারজানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে ঐ ছোকরা। ছিনিয়ে নেওয়া এত বেশি জরুরী মনে হয়েছিল যে জীবনদাতার প্রাণও সে নেবার চেষ্টা করেছিল সেই তাগিদে। তাহলে?

তাহলে এই সিদ্ধান্ত বোধহয় সঙ্গতভাবেই নেওয়া যায় যে লকেট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, বা লকেটের সঙ্গে জটিলভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারের নিষ্পত্তি করার জন্য মিচেলস কাপ্তেনের কাছে গিয়েছে। এবং কাপ্তেনও অবশ্যই আছে নিউকার্ডিফের সেনানিবাসে। দেখা যাক। লকেট প্রত্যর্পণের আগেই মিচেলসকে আবার ধরতে পারে কিনা টারজান। নিউকার্ডিফ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের বেশি ছাড়া কম হবে না। সেই পঞ্চাশের মধ্যে ত্রিশ মাইল আবার বিজন অরণ্যপথ। এই অরণ্যপথটুকু পেরিয়ে যেতে মিচেলস-এর অন্তত সাত-আট ঘণ্টা লাগবেই। পথে বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ না ঘটলেও লাগবে। তা এই দীর্ঘ সাত-আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যেও কি টারজান পারবে না তাকে পাকড়াতে?

পারা উচিত। টারজান বাতাসে গন্ধ পায় মানুষের ও জন্তুজানোয়ারের। মিচেলস তা পায় না। কোথাও একখানা ভাঙা ডাল, কোথাও মাটির উপর একটা অস্পষ্ট দাগ দেখে ঠিক ঠিক আন্দাজ করতে পারে, কোন প্রাণী সেখান দিয়ে চলে গিয়েছে, ঠিক কতক্ষণ আগে। সর্বোপরি, সে পারে আরণ্যশূন্য পথে ঝড়ের বেগে দূরত্ব অতিক্রম করতে। মিচেলস তো ছার, দুনিয়ার অন্য যে কোনো পুরুষ যা পারে না। এত সব সুবিধা থাকতেও মিচেলসকে পাকড়াতে পারবে না সে?

একে একে আটটা দিকের হাওয়া পরীক্ষা করল টারজান। পরীক্ষা নেওয়ার উপায় অবশ্য ঐ গন্ধ শোঁকাই! উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম বায়ু-অগ্নি নৈঋত-ঈশান। যাবে কোথায়? ঈশান কোণে মানুষের গায়ের গন্ধ এখনও ভাসছে মৃদু হাওয়ায়।

কালবিলম্ব না করে সেই দিকে পা চালিয়ে দিল টারজান। দুঃখ এই, ঠিক এই দিকটাতে বড় গাছের তেমন প্রাচুর্য নেই। থাকলে শূন্যপথেই যাত্রা শুরু করা সম্ভব হতো, তবে সেটা এক্ষুণি সম্ভব নয় যদিও, কিছুদূর এই পথে এগিয়ে যাওয়ার পরে সেদিক দিয়ে সুবিধা-সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে। না পারলেও, শ্রীচরণের গতিবেগ কি সমানই হবে টারজানের আর মিচেলস-এর? টারজানের যেটা ক্ষিপ্র গতি, অন্য লোকে সেটাকে বলবে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। বুনো ঘোড়া, বুনো হরিণকে সে হারিয়ে দেয় দ্রুতধাবনে।

অতি অল্পক্ষণ সেই দ্রুতধাবনের বেগে পথ চললো টারজান: আর তার ফলেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তার চোখে পড়ল মিচেলস-এর চেহারাখানি। লোকটা হাঁটছে ধীরগতিতে। অর্থাৎ, অশ্বারোহণে অভ্যস্ত মানুষটা এই সামান্য পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ফলে ইতিমধ্যেই দস্তুরমতো অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তা না হলে, মহারণ্যের এই দুরতিক্রম্য পথ প্রায় সবটাই যার সমুখে পড়ে আছে অনতিক্রান্ত, এরই মধ্যে সে টিমেতালে হাঁটা শুরু করে কখনো?

চোখে পড়ল মিচেলস-এর চেহারাখানি।

টারজান কিন্তু আরও একটা কথা ভাবছে। এই নির্জন বন, সমুখে মিচেলস প্রাণঘাতী শত্রু। অন্য জনমানব সারা অরণ্যে নেই। এ-সময়ে দু মিনিট যদি সে মেহনত করে একটু, দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে মিচেলসকে, ওর গলাটি টিপে দম বার করে দেয়, আর তারপরই অপহৃত লকেটখানা পুনরুদ্ধার করে ঝুলিয়ে নেয় নিজের গলায়, তাহলে তার ক্ষতি হয় কী? লকেট ফেরত পাওয়ার জন্য তাকে নিউকার্ডিফ পর্যন্ত যেতেই হবে, এমন তো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি তাকে!

না, মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি তাকে। কিন্তু টারজানের নিজের আছে একটা প্রখর বিচারবুদ্ধি। নিজের ভাল কিসে হবে অনেক লোক তাও বোঝে না। টারজান কিন্তু বিলক্ষণ বোঝে। আশৈশব আরণ্য জীবনযাপনের ফলেই এই শক্তিটা এত বেশি বেড়ে গিয়েছে তার। নিজের উপরে যাকে প্রতি পদক্ষেপেই নির্ভর করতে হয়, এটা তার পরিপুষ্টি লাভ।

সেই বিচারবুদ্ধিই আজ টারজানের হাত চেপে ধরেছে, তাকে পরামর্শ দিয়েছে—খবর্দার, না। এক্ষুণি নয়। যত রাগই তোমার থাকুক ঐ পাপিষ্ঠ গুপ্তচরটার উপরে, এক্ষুণি ওকে বধ করো না। কর যদি, তাতে তোমারই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। তুমি তো সেই অন্য পাষণ্ডটাকেও খুঁজছ? জেন-এর হত্যাকারী সেই কাপ্তেন মুয়েরবার্নককে? তাহলে তোমাকে পথ দেখানোর কাজ তো সবচেয়ে ভালভাবে করে দিতে পারবে ঐ মিচেলসই। লকেট ফেরত দেবার জন্য, হয়তো আরও কিছু কিছু জরুরী লেনদেনের জন্য মিচেলস তো খুব সম্ভব সেই নরহন্তার কাছেই যাচ্ছে এখন? তাহলে?

তাহলে কি তোমার পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে না, হত্যা করার পরিবর্তে ওর অনুসরণ করা? অতি সাবধানে, অতি নিঃশব্দে ওর পিছু পিছু গিয়ে দেখে আসা যে কাপ্তেনটা থাকে কোথায়? ভেবে দেখ, নিউকার্ডিফ শহর জায়গা। তুমি কেবল কানে শুনেছ যে সেখানে জার্মানদের সেনানিবাস আছে একটা। সে সেনানিবাস তুমি দেখনি, শহরের কোন অংশে সেটা, কোন পথে গেলে তুমি নিরাপদে পৌঁছতে পারবে সেখানে, কার্যসিদ্ধি করে আবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে অরণ্যের কোলে, সে সব তুমি কিছুই জান না। এ অবস্থায় মিচেলস-এর অনুসরণ করার চাইতে বিজ্ঞোচিত পন্থা তোমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। যাও ওর সঙ্গে, কাপ্তেনটাকে আবিষ্কার কর, তার ঘাড় মটকাও। তারপর ইচ্ছে কর যদি, গুপ্তচরটাকেও কাপ্তেনের সঙ্গে রওনা করে দিতে পার ভবপারে। তার অসুবিধা দেখলে সেটা পরবর্তী কোনো সুযোগের অপেক্ষায় মুলতুবিও রাখতে পার।

অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে টারজানের কানে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছে বিচারবুদ্ধি। সে গ্রহণ করেছে সেই উপদেশ, সে উপলব্ধি করেছে এক পরম সত্য। সেটা হলো এই যে কাপ্তেন ও মিচেলস, এই দুজনই তার শত্রু বটে, কিন্তু দুজনের মধ্যে চরম শত্রু হলো ঐ কাপ্তেন মুয়েরবার্নক। মিচেলস যা ক্ষতি করেছে, তা নগণ্য। স্রেফ টারজানকে খুন করার একটা চেষ্টা করেছে সে। তা সে চেষ্টা তো এযাবৎ হাজার লোকে করেছে, হাজার ন্যুমা শীটা মহাকপিতে করেছে। টারজানকে মেরে ফেলা, সে তো অর্ধেক আফ্রিকার অভিপ্রায়, ব্রত এবং লক্ষ্য। ওটাকে কোনোমতেই বিরাট একটা অন্যায় পরিকল্পনা বলে মনে করা যায় না।

পক্ষান্তরে, ঐ কাপ্তেনটা? ওর অপরাধ আরও সাংঘাতিক। ও হত্যা করেছে টারজানের একশোটা ভক্ত অনুরক্ত সৈনিককে, হত্যা করেছে টারজানের পত্নী জেনকে। এসবের কি ক্ষমা আছে? না, নেই ক্ষমা। মৃত্যুদণ্ড ওকে দিতেই হবে। যত শীঘ্র সম্ভব। তাই মিচলেসকে বধ করার সুযোগ পেয়েও বধ করেনি টারজান।

কিন্তু টারজানের হিসেব ভণ্ডুল হয়ে গেল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে। অরণ্যসীমার পরেও প্রায় বিশ মাইল পথ ঐ শহর নিউকার্ডিফ। সেই দূরত্বটা আবার অরণ্যহীন সমতল। প্রায় সেই সমতলে প্রবেশ করার মুখেই পড়ে জংলী মানুষদের চিরদিনের অস্বস্তিকর জিনিস, একটা রেলপথ। এইটিই জানা ছিল না টারজানের।

তাকে জানতে হলো একটা রূঢ় ধাক্কায়। দূর কান্তারের কোন এক অদৃশ্য নাবাল এলাকা থেকে হাওয়ায় ভেসে এল এক কানফাটানো আওয়াজ। প্রথমটা চমকে উঠলেও অচিরেই টারজান ধরে ফেললো যে এ শব্দটা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ। সে ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছে, রেলগাড়ির শব্দ কি আর চিনবে না?

সব হিসেব ভণ্ডুল হয়ে গেল। মিচেলস আগে আগে যাচ্ছিল। সে যদি ঐ ট্রেনে উঠে পড়ে? স্টেশন এই আরণ্য মুলুকে থাকে অবশ্য মাঝে মাঝে। থাকে মালপত্র চালানের সুবিধার জন্য। কিন্তু যাত্রী তোলার বা নামানোর ব্যবস্থা, এসব রেলপথে যেখানে সেখানেই করা সম্ভব। যে কোনো জায়গায় পথচর যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে চালকের, চালক থামিয়ে দেবে ট্রেন।

টারজান শুনল, হঠাৎ চলন্ত ট্রেন থেমে গিয়েছে। মাত্রই এক মিনিটের জন্য। তারপরই চলতে শুরু করেছে আবার। তার মানে তো স্পষ্ট। মিচেলস তাহলে উঠে পড়ল ট্রেনে। এবং সে ট্রেন আবারও দৌড় ধরেছে নিউকার্ডিফের অভিমুখে। টারজানের সাধ্য নেই সে ট্রেন ধরবার, কারণ সে পিছনেই পড়ে আছে ট্রেনের।

যাঃ! বেরিয়ে গেল খাঁচার পাখি খাঁচা থেকে। এখন মুয়েরবার্নকের সন্ধান করার ব্যাপারে মিচেলস-এর কোনো সাহায্য আর টারজান পাচ্ছে না। পুরো একটা দিন পিছনে পড়ে গেল সে। পুরো কুড়ি মাইল মাঠ পাড়ি দিতে হবে দুজনকেই। ট্রেন সে পাড়ি জমাবে এক ঘণ্টায়, টারজান নেবে সেখানে অন্তত চার ঘণ্টা।

(চলবে)

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

সত্যি !

দুটি গুলি দুটি ছিদ্র

জ্যাবেজ স্পাইসার ছিলেন ম্যাসাচুসেটসের লেডেনের বাসিন্দা। ১৭৮৭ সালের ২৫ জানুয়ারি এক বিদ্রোহের সময় স্প্রিংফিল্ডে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অস্ত্রাগার যখন আক্রান্ত হয় তখন স্পাইসার দুটি গুলির আঘাতে নিহত হন। সেই সময় তাঁর গায়ে ছিল সেই কোটটা যেটা পরে তাঁর ভাই ড্যানিয়েল মারা গিয়েছিলেন ৫ মার্চ ১৭৮৪ সালে। ড্যানিয়ালের মৃত্যুর কারণও ছিল দুটি গুলি। আর সবথেকে যা অদ্ভুত তা হলো তিন বছর আগে গুলি লেগে কোটে যে দুটি ছিদ্র হয়েছিল তার মধ্যে দিয়েই গুলি ঢুকে স্পাইসারের মৃত্যু ঘটায়।

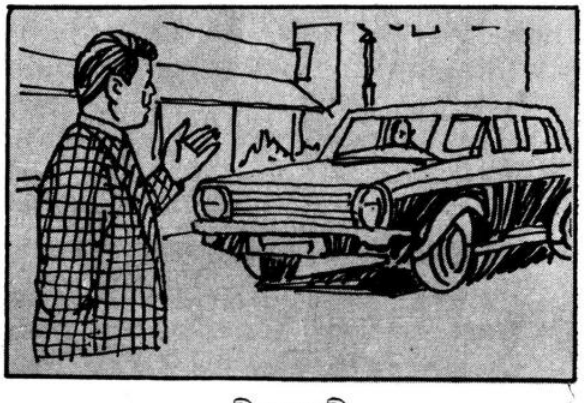

নীরব যাত্রী

বেডফোর্ডশায়ার কাউন্টির রয় ফুলটন একটি ম্যাচ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত হয়ে গেছে। স্ট্যানব্রিজ গ্রামের কাছাকাছি আসতেই তিনি দেখেন এক তরুণ হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে তাকে তুলে নিলেন ফুলটন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায় যাবে। উত্তরে তরুণটি আঙুল তুলে সামনের রাস্তা দেখিয়ে দিল। ফুলটন ভাবলেন সে মূকবধির, তাই কিছু না বলে গাড়ি চালাতে লাগলেন। প্রায় মাইলখানেক যাবার পর তিনি একবার ঘুরে তরুণটিকে দেখতে গেলেন আর তখনই চোখ কপালে উঠল তাঁর। পাশের সিট খালি, দরজা না খুলেই ছেলেটি চলন্ত ভ্যান থেকে উধাও হয়েছে। ফুলটনের কাহিনী শুনে পুলিশ মন্তব্য করেছিল, তিনি অদ্ভুত কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন, হয়তো তাঁর কথা সত্যি।

ট্যাভারশাম হল

ট্যাভারশাম হল নরউইচের কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলের চারপাশের মাঠে আর্মি ক্যাম্প পড়ে। এই ক্যাম্পেই ছিলেন আর্থার বাটারওয়ার্থ। লন্ডনের এক বই বিক্রেতার কাছে তিনি সঙ্গীতের ওপর একটা সেকেন্ডহ্যান্ড বই চেয়ে পাঠান। বইটা যখন পৌঁছায় তখন বাটারওয়ার্থ ক্যাম্পের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পার্সেলটা খোলেন। খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবিওলা পোস্টকার্ড মাটিতে পড়ে যায়। বইটা আগে যাঁর ছিল তিনিই হয়তো ওটা পাতায় নিশানা দিতে রেখে দিয়েছিলেন। যাই হোক কার্ডটা তুলে নিয়ে বাটারওয়ার্থ দেখেন তাতে তারিখ লেখা আছে ৩ আগস্ট ১৮১৩। উল্টে ছবিটা দেখতে গিয়েই তিনি চমকে ওঠেন। জানলা দিয়ে যে ট্যাভারশাম হলকে দেখা যাচ্ছিল তারই ছবি কার্ডের ওপর। যেহেতু যুদ্ধের সময় আর্মি ক্যাম্পগুলো নামের বদলে শুধু পোস্ট কোড দ্বারা চিহ্নিত হতো সেক্ষেত্রে বিক্রেতার জানার কথা নয় তিনি বইটা কোথায় পাঠাচ্ছেন। সুতরাং কার্ডটা উপহার হিসেবে তাঁর পক্ষে পাঠানো সম্ভবও ছিল না। তাহলে ঠিক ট্যাভারশাম হলেরই ছবিওলা পোস্টকার্ড বইয়ের মধ্যে এল কি করে?

ছবি : সুফি

হাঁদা-ভোঁদার

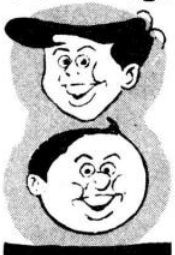

যন্ত্র নির্মাণ

তোর বন্ধু হাঁদা যে দলে ভিড়েছে সেই পেটো মস্তানের ক্লাবে আমরা হামলা করবো। এর জন্যে একটা সাঁজোয়া গাড়ি বানাতে তুই আমাদের সাহায্য করবি!
পরে
এটা প্রায় মোটামুটি তৈরি!
ঠিক আছে, ভোঁদা! তবে এটা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা প্রমাণের জন্যে তোকে আমাদের সঙ্গে হামলায় যেতে হবে!
কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই না।
ভেতরে ঢুকে এঁটে বসে থাক!
আমরা একেবারে সোজা পেটো মস্তানের আখড়ার দিকে যাচ্ছি, গুলেদা!
সঠিক নিশানা!
ধড়াম!
ওরে বাবা রে! এটা কি হলো রে!
ইঁয়ুফ্!
এই এটা হজম কর! আঁউরফস্!
ওয়াহ্!
ঘপাৎ!
ওউফ্!
অ্যাই মরেচে! দুটো গ্যাংই দেখছি পরস্পরকে ল্যাং মেরে বেহুঁশ করে দিয়েছে!
আমাকে তুলে নিয়ে যা, ভোঁদা!
ঠিক আছে, আমি যে সমস্ত কাম করে দিয়েছি তার দাম হিসেবে আমি এই শুকতারার গাদাটা নিয়ে নিচ্ছি!
দুর্দান্ত! রাত্রে এতো শুকতারা পড়ার জন্যে আমার এই নতুন আলো একেবারে সঠিক জিনিস!

নিউরোনের জালে খগেনবাবু

সুনীত রায়

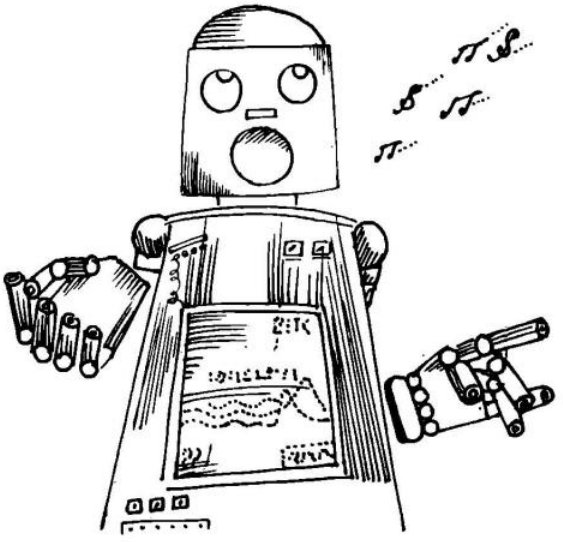

স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, বাস-ট্রামে প্রায় সবার মুখেই এখন একটাই নাম—খগেনবাবু। আলোচনা হলে খগেনবাবু, আড্ডাতে খগেনবাবু, আবার তর্কের বিষয়বস্তুও খগেনবাবু। কে এই খগেনবাবু? নাম শুনে তো মনে হয় না কোনো দেশের বড় নেতা, নামী ডাক্তার কিংবা বিজ্ঞানী। অবশ্য নামের সঙ্গে কাজের যে কোনো সম্পর্ক নেই সেটাও ঠিক। তবুও কেন জানি না মনে হয় খগেনবাবু এসব পেশার বাইরের লোক। সেদিন টিফিনের সময় পিকু, কুটুন আর ঋজুর মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা। পিকু বলছে—জানিস, খগেনবাবু আমার সঙ্গে দাবা খেলেছে। কুটুন একটু মুখটা ভেংচে বলল—দাবাটা আর কি এমন বড় কাজ। আমি বললাম—খগেনদা, একটা ছবি এঁকে দেবেন? মুহূর্তের মধ্যে ছবি আঁকা হয়ে গেল। সবার শেষে ঋজুও তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে চাইছিল।

সোহম দূর থেকে বসে বসে আলোচনাটা শুনছিল। আর মনে মনে ভাবছিল—খগেনবাবু দাবা খেলেছেন, ছবি এঁকেছেন, আরও কত কি না করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে অসাধারণ ব্যাপারটা কি আছে! আমিও দাবা খেলতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে পারি...বিড়বিড় করে আরও কিছু হয়তো বলত, তার আগেই পিকু সোহমকে একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, খগেনবাবুর কাছে এটাই বড় ব্যাপার। খগেনবাবু মানুষ নয়, ওটা মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্রমানব কিংবা রোবট। বিড়লা মিউজিয়ামে যে বিজ্ঞানমেলা চলছে সেখানে গেলেই ওকে দেখতে পাওয়া যাবে। কল্পবিজ্ঞানের বইতে রোবটের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে দেখার এটাই বড় সুযোগ। তাছাড়া একটা যন্ত্র, মানুষের মতো কাজ করছে বলেই এত হৈচৈ আর এত হাঙ্গামা। টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়তেই যে যার ক্লাসে ফিরে গেল।

পরের দিনটা শনিবার। আর কলকাতা শহরেও খগেনবাবুর সেটাই ছিল শেষ দিন। স্কুল থেকে ফিরেই সোহম তার অতি প্রিয় মামাটিকে ফোন করে বলল, কাল বিড়লা মিউজিয়ামে খগেনবাবুকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আর বেশি কিছু বলতে হলো না। ওদিক থেকে মামার গলা ভেসে এল—তুমি আর মিতুল তৈরি হয়ে থেকো। আমি তোমাদের মেলায় নিয়ে যাব।

মেলায় এসে বোঝা গেল, আজই শেষ দিন। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। খগেনবাবুর অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে কলকাতা শহর যেন ভেঙে পড়েছে। সোহম, মিতুলও অনেক ধরনের ধাঁধা আর সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে খগেনবাবুর পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করল। খগেনবাবুর জ্ঞানের পরিধি দেখে ওরা সত্যিই অবাক হয়ে গেল। চলে আসার আগে সোহম জিগ্যেস করল, খগেনবাবু, তুমি যে সারাদিন এত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ তাতে তুমি ক্লান্তিবোধ করছ না! কোনো উত্তর নেই। তুমি যে কাল আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে না? এবার পরিষ্কার বুকের মধ্যে লাগানো টিভি স্ক্রীনটায় লেখা হয়ে গেল, মানুষের মতো দেখতে বা মানুষের মতো কাজ করি বলেই তো আর আমি মানুষ নই। আনন্দ, দুঃখ, ক্লান্তি ওসব কথাগুলো শুনেছি, কিন্তু আসলে ওগুলো কি সেটাই আমি জানি না। আর কেন জানি না এটাও আমার অজানা।

মেলা থেকে ঘুরে আসার পর থেকেই সোহম একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। কারুর সঙ্গে ভালো করে কথাও বলছিল না। এখন তার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। খগেনবাবু দেখতে মানুষের মতো, কাজকর্ম করছে মানুষের চেয়ে দ্রুত আর নির্ভুল, জ্ঞানের পরিধিও বিশাল। তবুও কেন তার মধ্যে মানুষের মতো অনুভূতি নেই? খগেনবাবু কোনোদিনই সম্পূর্ণ মানুষ হবে না, যতদিন না ওর মাথার মধ্যে নিউরোনের জালটা বসানো হচ্ছে। সোহমের মনের কথাটা বলতে বলতে ঋজু, পিকু, কুটুন, ঋক্, নীলু সবাইকে নিয়ে শমীকদা চেয়ারে বসে কাঁধের ঝোলাটা সেন্টার টেবিলে রেখে সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

দেওয়ালে টাঙানো ডলফিনের বড় পোস্টারটা দেখে শমীকদা বলল, কি অদ্ভুত প্রাণী! সবাই বেশ বুঝতে পেরেছে শমীকদা আজ খুব মেজাজে আছে। শমীকদা শুনেছিল যে সোহম, মিতুল ওরা সব খগেনবাবুকে আজ দেখতে গিয়েছিল। তাই শমীকদা বলল, খগেনবাবুকে দেখে সবারই এই কথাটা মনে হয়েছে, খগেনবাবুর নিজস্ব বুদ্ধি কবে হবে। খগেনবাবুর জন্যে দরকার কৃত্রিম বুদ্ধি। আর এই কৃত্রিম বুদ্ধি নিয়ে গবেষণা বহুকাল ধরেই শুরু হয়েছে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শমীকদা বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আজ অব্দি আমরা নিজে থেকে নতুন কিছুই আবিষ্কার করিনি। যা কিছু আবিষ্কার করেছি বলে হৈচৈ করছি তা সবই প্রকৃতিতে আগে থেকেই ছিল। অর্থাৎ পাখির আকাশে ওড়া দেখে মানুষ উড়তে চাইল, তৈরি হলো এরোপ্লেন, আবার জলের মধ্যে দিয়ে ডলফিনের দৌড়ানো দেখে তৈরি হলো টর্পেডো। এ ধরনের উদাহরণ দিতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে। এ কথাটা বলার একমাত্র কারণ হলো এই যে বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করছে। দৈনন্দিন জীবনকে কিভাবে আরও সহজ আর সাবলীল করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের মতো ১৯৫৮ সালে একটা নতুন বিষয়ের উদ্ভব হলো, তার নাম হচ্ছে সাইবারনেটিক্স।

গাছপালা, জীবজন্তুর কোনো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে কাজ করছে সেটার ওপর গবেষণাই হলো সাইবারনেটিক্স। আর গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সেটা যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে নিয়ে আসে যে বিষয় সেটা হলো বায়োনিক্স। বলতে পারা যায়, এই দুটি বিষয়ই একটা মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সবার চোখমুখের অবস্থা দেখে শমীকদার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ব্যাপারটা আর একটু সহজ করে বলা দরকার। দেওয়ালে টাঙানো ডলফিনের ছবিটা দেখিয়ে বলল, জলের গভীরে ডুব দিয়ে অত দ্রুতগতিতে দৌড়তে খুব কম প্রাণীই পারে। কি ভাবে এরা জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে দৌড়ায়, তা নিয়ে সাইবারনেটিক্সের বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন। যখন ভাবনা শুরু হয়েছিল তখন নিছক কৌতূহলবশেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু যখন উত্তর পাওয়া গেল তখন তার ওপর ভিত্তি করেই বায়োনিক্সের বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন টর্পেডো। দেখা গেল, টর্পেডো জলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে, কিন্তু গতিটা ডলফিনের তুলনায় খুবই কম। আবার শুরু হলো গবেষণা। ডলফিনের দেহের চামড়ার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যেটা চলার পথে জলের বাধাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে ঐ ধরনের একটা চাদর তৈরি করে টর্পেডোর দেহে জড়িয়ে দেওয়া হলো। হাতেনাতে ফল পাওয়া গেল। গতি আগের থেকে অনেকগুণ বেড়ে গেল। প্রকৃতিতে এ ধরনের বহু ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে চলেছে

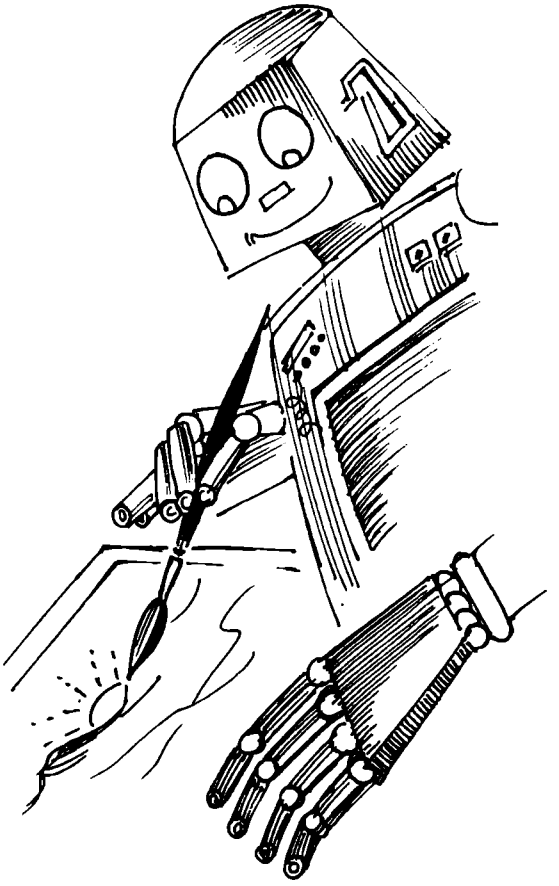

খগেনবাবু ছবিও আঁকেন।

যার সঠিক কার্যকারণ আজও আমাদের অজানা। যদি জানা যেত তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যেত।

শোনা যাচ্ছে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পেট্রল, কয়লা সব ফুরিয়ে যাবে। তখন শুরু হবে প্রচণ্ড জ্বালানী সমস্যা। বিকল্প শক্তির কথা আমরা ইতিমধ্যে ভাবতেও শুরু করেছি। সৌরশক্তি, পারমানবিক শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এদিকে অত্যধিক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে শুরু হবে খাদ্যসমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি আমরা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির পদ্ধতিটা জানতে পারি—কথাগুলো বেশ বিজ্ঞসুলভ চালে বালে কার ডাকে সাড়া দিয়ে মিতুল উঠে ভেতরে চলে গেল। শমীকদাও মিতুলের কথার প্রসঙ্গ টেনে বলল, ব্যাপারটা খুবই সত্যি। আমরাও যদি গাছেদের মতো নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারতাম তাহলে যে কত সমস্যার সমাধান হতো তা ভাবা যায় না। এটাও বায়োনিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। আর এসব ভাবনাচিন্তা করতে করতে মানুষের মাথায় পোকা এমন নড়ে উঠেছে যে তার নিজের মাথার মধ্যে

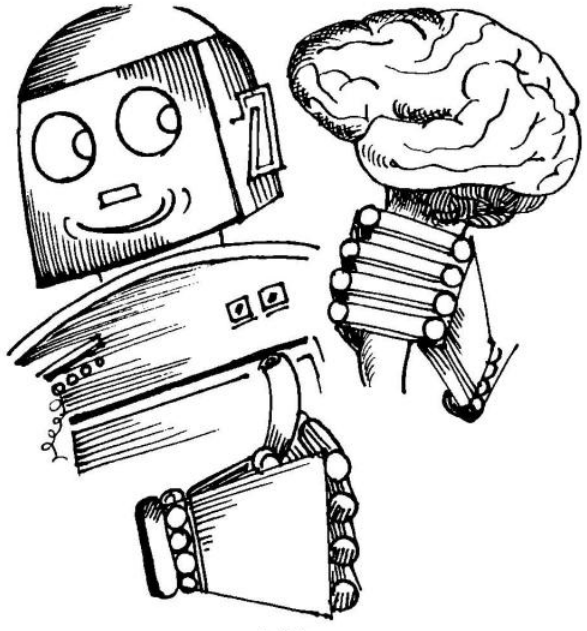

খগেনবাবুদের চাই নিউরোনের জাল।

কি আছে, সেটা জানা দরকার। সারা শরীরের তুলনায় আমাদের মস্তিষ্কটা কত ছোটো। আয়তন হবে এক লিটারের মতো আর ওজন হবে প্রায় তেরোশো গ্রাম। কিন্তু কি প্রচণ্ড তার ক্ষমতা! কম্পিউটারের আবিষ্কারের পর থেকেই তাই শুরু হয়ে গেছে কৃত্রিম বুদ্ধি নিয়ে গবেষণা। আমরা কত সহজেই চিনতে, বুঝতে, মনে রাখতে পারি। কত রকমের চিন্তা একসঙ্গে করতে পারি। কেউ শেখালে শিখতে পারি। আরও কত কি যে পারি তা তোমরা আমার থেকে ভালো জান। এত ধরনের ক্ষমতা যার মধ্যে রয়েছে আর প্রতিটি কাজ এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে সেটা আমার কাছে একটা সুপার কম্পিউটার। মজার ব্যাপার হলো, এত শক্তিশালী কম্পিউটারটা চালাতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা এতই সামান্য যে মনে হয় এর মধ্যে কিছু ভুতুড়ে ব্যাপার আছে।

ভূত হোক আর ভুতুড়ে ব্যাপার হোক, মানুষের সারা শরীরটাই একটা অতি উন্নতমানের যন্ত্র। যন্ত্র ভালোভাবে চালাতে হলে দরকার পরিমাণমত জ্বালানী আর এই অতি উন্নতমানের যন্ত্রটার কাছ থেকে ভালো ফল পেতে হলে তাকে দিতে হবে হিংয়ের কচুরি আর কাশ্মীরী আলুর দম। আমরা সবাই চেয়ে আছি হরিয়ার হাতের ট্রেটার দিকে। মিতুল আর সোহম দুজনে মিলে সবাইকে খাবার পরিবেশন করতে লাগল।

আলুর দম দিয়ে একটা কচুরি মুখে পুরে দিয়ে শমীকদা বলল, এ ধরনের ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আড্ডাটা কেমন পানসে পানসে লাগে। ঋক বুড়ো আঙুলটা চেটে নিয়ে বলল, আলুর দমটা ঝাল হয়েছে, কিন্তু খেতে খুব ভালো। শমীকদাও মাথা নেড়ে জানাল, এ ব্যাপারে তারও মত এক। মুখের খাবারটা শেষ করে শমীকদা বলল, কিছু দেখে বোঝা কোনটা খাবার জিনিস, আবার খাওয়ার পর বোঝা কেমন খেতে হয়েছে এসবই খগেনবাবুর অজানা। কারণটা কি?

এটা আবার কি কথা? খগেনবাবুর কি মানুষের মতো বুদ্ধি আছে যে বুঝবে এটা কি আর ওটা কি? সোহম কেমন জানি একটু বিরক্তি সহকারে কথাগুলো বলল। কুটুন প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে বলল, শমীকদা, খগেনবাবুর মাথায় আমাদের মতো বুদ্ধিটা কবে বসবে বলতে পার।

খাওয়াপর্ব সাঙ্গ হয়ে গেছে। শমীকদা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কুটুনের দিকে তাকিয়ে শমীকদা বলল, খগেনবাবুর জন্যে কৃত্রিম বুদ্ধি তৈরি করার আগে জানা দরকার আমাদের মাথার মধ্যে ঘটনাটা কি ঘটছে। নিউরোন হলো এক ধরনের স্নায়ুকোষ। মস্তিষ্কের মধ্যে এরা একসঙ্গে একটা জাল বিস্তার করে রয়েছে। শুধু মস্তিষ্কেই এদের সংখ্যা হলো ১০০ বিলিয়ন। আবার প্রতিটি নিউরোন অন্যান্য প্রায় ১০০০০ নিউরোনের সঙ্গে যুক্ত। তার ফলে যে জালটা তৈরি হলো তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল ১০০০ ট্রিলিয়ন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউরোনকে এক একটা ছোটখাটো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রতিটি নিউরোনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রতিটি স্তরের দৈর্ঘ্যে ৬৪টি আর প্রস্থে ৬৪টি অর্থাৎ প্রায় ৪০০০টি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এখন যদি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ করা হয় তাহলে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১.৬ কোটি। এক্ষেত্রে যোগাযোগটা সারিবদ্ধভাবে হয় না—যোগাযোগটা হয় সমান্তরালভাবে। এখন নিশ্চয়ই খানিকটা অনুমান করা যাচ্ছে আমাদের মাথার মধ্যে নিউরোনের জালটা কি প্রচণ্ড জটিল।

আমাদের শরীরে যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে তারা হলো.... শমীকদার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে পিকু বলল, চোখ, কান, নাক, জিব আর চামড়া। এদের সাহায্যেই আমরা বাইরের সংকেত গ্রহণ করি আর তা বিভিন্ন স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়।

তারপর কি হয়? নীলু একটু বোকা বোকা মুখ করে জিগ্যেস করল।

মস্তিষ্কে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটি নিউরোন সজীব হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আরও হাজারটি নিউরোন জেগে ওঠে। তারা আবার জাগিয়ে দেয় আরও লক্ষ লক্ষ নিউরোনকে। ঘটনাটা এত তীব্রগতিতে হয় যে সময়ের অনুপাত করাটা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। আগেই বলেছি, প্রতিটি নিউরোন এক একটা ছোটখাটো কম্পিউটার আর এরা সবাই সমান্তরালভাবে যুক্ত। তাই বিভিন্ন নিউরোনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ যেটা আগে দরকার কিংবা পরে দরকার সবকিছুই একসঙ্গে মিলিত হয়ে উত্তরটা বেরিয়ে

আসে নিমেষের মধ্যে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিটা জৈবরসায়নের ভিত্তিতে হয়। নিউরোনের এই জালটিকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'নিউরাল নেট ওয়ার্ক'। ১৯৮৭ সালে আমেরিকায় প্রথম 'নিউরাল নেটওয়ার্কের' ওপর আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা বসেছিল। প্রায় দু' হাজার জন বিজ্ঞানী এতে অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ স্বাভাবিক বুদ্ধি কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন, আবার কেউ স্বাভাবিক বুদ্ধির কার্যপদ্ধতির কিছুটা হদিস পেয়ে কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে তৈরি করা যায় তার ওপর মন্তব্য করেন।

আজকের আড্ডাটা মনে হয় ঋজুর খুব একটা ভালো লাগছিল না। তাই মাঝে মাঝেই চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য রেখে শমীকদা ঋজুর মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, মাথার মধ্যে যে নিউরোনের জালটা রয়েছে সে সম্বন্ধে প্রথম ধারণা করেন বিজ্ঞানী রোসেনব্লার্ব। তিনিই প্রথম বলেন, কম্পিউটার শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করবে না। মানুষের মতো তারাও নিজে থেকে ভাববে, শিখবে, চিনবে আর অনুভব করবে। তাঁর আবিষ্কার 'পারসেপ্ট্রন' কিছু কিছু জিনিস দেখে চিনতে পারত, নকশা দেখে বুঝতে পারত। যদিও ব্যাপারটি ছিল খুবই সাধারণ, কিন্তু যাঁরা যন্ত্রমানব নিয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁদের কাছে ওটা নূতন দিগন্তের সূচনা করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তখন থেকেই মস্তিষ্কের কার্যকলাপের হদিস খুঁজে বের করে খগেনবাবুদের মাথায় তা কৃত্রিম উপায়ে বসানোর চেষ্টা শুরু হয়।

আগামী দশ বছরের মধ্যে মানুষের সমান নিউরোনের জাল তৈরি না হলেও কিছুটা অংশ তৈরি করা সম্ভব হবে। সিলিকন চিপস্ দিয়ে কৃত্রিম নিউরোনের জাল বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি করা হবে। বাগানের মালীর কাজে, জনবহুল রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশনের কাজে, এমনকি রান্নার কাজেও খগেনবাবুদের ব্যবহার করা হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন খগেনবাবু যেদিন পৃথিবীতে এসে যাবে তখন কি এই সাধারণ কম্পিউটার কোনো কাজেই আসবে না? নীলুর কথাটা সত্যিই খুব যুক্তিযুক্ত। তখন ঋজু বলল, ব্যাঙ্কে টাকা তোলার জন্যে চেক জমা দিলে চেকের সইটা পরীক্ষা করবে খগেনবাবু আর টাকার হিসেব করবে সাধারণ কম্পিউটার। ঋজুর সুন্দর উপমাটি শুনে সবাই হেসে উঠল।

এটা কিছু হাসার বিষয় নয়—মিতুল বেশ উদ্বিগ্নভাবেই বলল। খগেনবাবুরা যখন সত্যি সত্যিই মানুষের মতো কাজ করবে তখন মানুষ কি করবে? তখন কি শুরু হয়ে যাবে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা? এসব দেখে মনে হয় খগেনবাবুকে মানুষের মতো তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই—সোহমও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যে ভয় পেয়েছে সেটা তার গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল।

অচেনাকে চিনব আর অজানাকে জানব—সে আগ্রহ মানুষের চিরকালের। আর সেজন্যেই তো এত সব জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা। ভগবান মানুষ তৈরি করেছেন আর মানুষ যাতে ভগবানকে ভুলে না যায় সেজন্যে সুখ-দুঃখের কিছুটা অংশ নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। নিউরোনের জটিল জালে খগেনবাবুকে জড়িয়ে ফেলার আগে হয়তো মানুষও সেরকম কিছু নিজের হাতে রেখে দেবে।

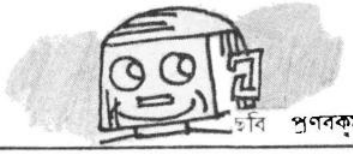

ছবি প্রণবকুমার হাজরা

জানো কী

- ☐ বাইরে বেরিয়েই প্রশান্ত বিস্ময়ে হতবাক। অন্ধকারের মধ্যেই সে দেখতে পেলো বাগানের শুধু একটা জায়গায় উদ্দাম হাওয়ার মাতামাতি। আর তার মধ্যে একজন মানুষ নিজেকে খাড়া রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
- ☐ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় শুভ্র আর অভ্র জঙ্গলে গিয়েছিলো। ফেরার পথেই বিপত্তি। ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। ভয়ে আর ভাবনায় ওরা দিশাহারা হয়ে পড়লো। আর তারপরই....
- ☐ ট্রেন চলেছে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। ঠিক তখনই দুজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে এসে ইঞ্জিন ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠলো, থামাও ট্রেন...
- ☐ গরু আর শুয়োরের তাড়ায় সব যখন ছত্রভঙ্গ, কনরাডও পালাচ্ছে, সৈন্যদের গুলি তার গায় লেগেছে, তখনই সেখানে এসে হাজির হলো ম্যাম'জেল। কি হলো এর পর...
- ☐ ভীষণ বিপদ! ভয়ের একটা চিঠি এসেছে। সেই চিঠিতে সক্কলের নাম। এমন কি টুটুরও। কিন্তু কি আছে সেই চিঠিতে? অতো ভয় পাবারই বা কি আছে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার পৌষ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই।

তিতলির যাদু-পুতুল

- পল্লব পূততুন্ড
- দোনা পূততুন্ড

দক্ষিন শহরতলীর একটি বাড়ি। বাড়ির এক-মাত্র শিশু তিতলির অষ্টম জন্মদিনের হুল্লোড় স্তিমিত প্রায়। রাত তখন দশটা। অতিথিরা একে একে ফিরে গেছেন....

বাপি, সবাই তো চলে গেল, কাকাসোনা তো এখনও এসে পৌঁছাল না!

নিশ্চয়ই গাড়ি লেট করছে সোনা!

অধৈর্য প্রতীক্ষা শেষ হলো...

মামনি—

কাকা-সোনা!

তোমার মামনি তো ছেলের চিন্তায় প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল ঠাকুরপো!

ট্রেন প্রায় চার ঘন্টা লেট করল বৌদি!

তোমাদের নিয়ে কাল কেনাকাটা করতে বেরোব!

তাড়াহুড়োতে তোমাদের জন্য কিছুই আনতে পারিনি! শুধু—

তিতলির জন্য এই পুতুলটা এনেছি! মোঙ্গোলীয়ান ফাইটার— নাম গোম্বো। একশো বছরেরও বেশি পুরোনো!

?

একশো বছর... বলিস কী?
কোনও কিউরিও শপ থেকে কিনলে নাকি ঠাকুরপো? মনে হচ্ছে জীবন্ত!
কিনিনি বৌদি! উপহার পেয়েছি! এক প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রামের লুপ্তপ্রায় এক উপজাতির সর্দারের কাছ থেকে!
আরেকটু খুলে বলো না ভাই! কৌতূহলে মরে যাচ্ছি এদিকে!
সরকারী নৃতত্ত্ববিদ টিমের সঙ্গে আমি তখন ওদের গ্রামে... গোর্খাদের সম-গোত্রীয় উপজাতি... লুপ্তপ্রায়... বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলো থেকে অনেক দূরে... ওদের সর্দার তখন মারাত্মক ও ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত...
ভরসা রাখো সর্দার! তোমাকে ভাল করবোই!
মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি! কোনও আশা নেই, শহরের মানুষ!
সঠিক চিকিৎসা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম ওকে বাঁচাল...
নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, শহরের মানুষ, তাই আমাদের পরিবারের সব-চাইতে পবিত্র জিনিসটা তোমাকে উপহার দিতে চাই!
তুমি ভাল হয়ে গেছ, এতেই আমার পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেছে সর্দার!
এটা দেখ! চার পুরুষ ধরে এটা আমাদের বংশে আছে! গোম্বো, শুভশক্তিসম্পন্ন আশ্চর্য যাদু-পুতুল!
যাদু-পুতুল! ফোঁয-
আশ্চর্য, যেন নড়ে উঠবে এখনি! এটাকে যাদু-পুতুল বলছ কেন?
কারণ এটা তাই! দেখছ না একশো বছরে এটা একটুও পুরোনো হয়নি!
?

(চলবে)

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভ্যাঙ্কুভার থেকে চিকাগো

স্বামীজী আসার ৭ বছর আগে ১৮৮৬-তে গোটা ভ্যাঙ্কুবর শহরটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে বাড়ি-ঘর দোকানপাট সব গড়ে উঠেছিল। স্বামীজী যখন পৌঁছলেন তখনও সেখানে শ্মশানের গন্ধ। এই সীমান্ত শহরটিতে সে সময় মাত্র ১৬ হাজার লোক বসবাস করত। কানাডার অন্তর্গত এই ভ্যাঙ্কুভার থেকে ট্রেনে চেপে পূর্বদিকে এগোলে পৌঁছানো যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। রেল-স্টেশনে গিয়ে স্বামীজী খবর নিয়ে জানলেন রাতের শেষ ট্রেনটি কিছুক্ষণ আগেই ছেড়ে চলে গেছে। তাই সে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরদিন ট্রেন ধরলেন। ট্রেনের জানালা দিয়ে কখনো দেখা যাচ্ছিল দূরের বরফে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়, আবার কখনো ঘন সবুজ বন চলে আসছিল খুব কাছাকাছি। পথের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে ৩০ জুলাই ১৮৯৩ স্বামীজী পৌঁছলেন চিকাগোয়। অবশ্য এর মধ্যে তাঁকে তিনবার ট্রেন পালটাতে হয়েছিল।

স্বামীজীর মতো ঐ একই পথের যাত্রী ছিলেন প্রাচ্যের আরও অনেক মানুষ। এঁরা সকলেই যাচ্ছিলেন ওয়ার্ল্ড কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশন বা বিশ্বমেলা দেখতে। অবজারভেশন কেবিনে বসে স্বামীজীকে এবং এইসব যাত্রীদের মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা; নাম কেটি সানবার্ন।

চিকাগো থেকে আরো পুবে বস্টন শহরের কাছে তাঁর একটি খামারবাড়ি ছিল, নাম 'ব্রিজি মেডোজ'। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীমতী সানবার্ন নিজে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং খামারবাড়ির ঠিকানাটি দেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বামীজীকে এ কথাও বলেছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, কারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বহু ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর চেনাজানা আছে। বস্তুত মিশুকে সদালাপী, সুবক্তা ও সুলেখিকা শ্রীমতী সানবার্নকে চিকাগো ও বস্টনের অনেকেই চিনতেন।

চিকাগো শহরে

৩০ জুলাই, ১৮৯৩, রাত এগারোটায় চিকাগো শহরে পৌঁছেই স্বামীজী মহাবিপদে পড়লেন। রেলের একদল কুলি তাঁর মালপত্র ধরে বেদম টানাটানি শুরু করল। তাদের দাবি তারা সব মাল বয়ে নিয়ে যাবে এবং সেজন্য তাদের মোটা রকম মজুরি দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় একজন লোক এগিয়ে এল তাঁর সাহায্যে।

লোকটি আসলে এসেছিল হোটেলের জন্য খরিদ্দার খুঁজতে। স্বামীজীকে একজন প্রাচ্য পণ্ডিত মনে করে এবং কিছুটা নিজের রোজগারের জন্যে সে-ই তাঁকে কোনোমতে কুলিদের হাত থেকে উদ্ধার করে তল্পিতল্পাসহ নিয়ে গিয়ে তুলল স্টেশনের বিশ্রামঘরে, পরামর্শ দিল, এখনই তাঁর কোনো একটা ভাল হোটেলে যাওয়া উচিত। নতুবা পদে পদে ঠকতে হবে। স্বামীজী লোকটির কথা শুনে বুঝলেন সে ঠিকই বলেছে।

এর পর তিনি সেই লোকটির সাহায্যেই বিশ্বমেলার কাছাকাছি একটা ভাল হোটেলে গিয়ে উঠলেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। লোকটি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামীজী তাঁর তল্পিতল্পার উপরেই শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে তিনি গেলেন বিশ্বমেলা দেখতে। মেলায় যা দেখলেন তা রীতিমতো অবাক হওয়ারই মতো। সারা পৃথিবীর শিল্পসম্ভার একত্রিত হয়েছে সেখানে। এ যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মার সঙ্গে প্রতিযোগিতা—কে বড় ? দেবকারিগর না মানুষ ? বিশ্বমেলা দেখে ধর্মমহাসভার খবর নিতে গিয়ে স্বামীজী বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন। প্রথমত যে সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন সে সভা শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর। তার মানে আরো তিন মাস পর। দ্বিতীয়ত, ঐ সভার প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ দিন পার হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতিনিধিত্ব করতে হলে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র থাকা দরকার। শুধুমাত্র নিজের পরিচয়ে এখানে জায়গা করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু স্বামীজী মনের বল হারালেন না, কারণ তিনি যে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন। ও সব বাঁধাধরা ছক তাঁর জন্য নয়। গুরু তাঁর ভরসা। নিজের পথ তিনি নিজেই করে নেবেন। পর পর ১২ দিন ধরে বিশ্বমেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন মানুষের চমকপ্রদ সব সৃষ্টি।

কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশনের মতো অত বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী এর আগে পৃথিবীর কোথাও কখনো হয়নি। আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এটির আয়োজন করা হয়েছিল। মেলা বসেছিল ৩ হাজার বিঘার সমান জমি নিয়ে। এর মধ্যে ৬ বিঘার সমান জায়গা নিয়ে একটি ২০ তলা বাড়ি তৈরির কথাও শোনা গেছিল। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও ১৫০ ফুট বেশি উঁচু একটি টাওয়ার ও মাটির নিচে দিয়ে একটি সুড়ঙ্গপথও বানানো হয়েছিল সেখানে। বস্তু-জগৎ ও মনোজগতের মোট ২০টি বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছিল ঐ মেলায়। ঐসব বিষয়গুলিতে তখনও পর্যন্ত মানুষ যত কিছু উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছিল সে সমস্ত কিছুকেই একত্র করার প্রবল আগ্রহ ছিল কর্মকর্তাদের মনে। এর মধ্যে ধর্মমহাসভাটি হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

কেটি সানবার্নের আতিথ্যে

চিকাগোতে এই ১১/১২ দিন থাকার সময়েই সদ্যপরিচিত স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীজী ঠিক করেছিলেন নিকটবর্তী ছোট শহর বস্টনে চলে যাবেন। কারণ সেখানে একটু কম খরচে থাকা যাবে আর সেখান থেকেই স্বাধীনভাবে ভারতীয় কায়দায় ভারতের বাণী প্রচার করা যাবে। সম্ভবত ১৩ আগস্ট, ১৮৯৩ তিনি ট্রেন ধরে বস্টন পৌছান এবং কুইনসি হাউস নামের

একটা ভাল হোটেলে ওঠেন। এই হোটেলে থাকার সময়ে রাস্তায় বেরুলেই দুষ্টু ছেলেরা স্বামীজীর পিছনে লাগত, তাঁর পোশাক-আশাক নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। একবার তো এমন হয়েছিল যে তাদের হাত থেকে বাঁচতে তাঁকে দৌড়ে একটা গলির মধ্যে গিয়ে লুকোতে হয়েছিল।

যাই হোক, দু-একদিন এইভাবে কাটাবার পর স্বামীজী কেটি সানবার্নকে ৫৪ শব্দের একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী সানবার্নও চিকাগো থেকে বস্টনে তাঁর ব্রিজি মেডোজে ফিরে এসেছিলেন। অবশ্য তিনি তখন খুব সুস্থ ছিলেন না। চিকাগোতে মেলা দেখতে দেখতে তিনি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং ব্রিজি মেডোজে ফিরে বিছানা নিয়েছিলেন।

স্বামীজীর টেলিগ্রাম যখন পেলেন তখন সবে তিনি একটু সুস্থ হয়েছেন। টেলিগ্রাম পেয়েই শ্রীমতী সানবার্নের মনে পড়ে গেল সেই অনন্যসাধারণ মানুষটির কথা, যাঁকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। ওঁর কথা তিনি একদিনের জন্যেও ভোলেননি। বস্টনে এসেই বন্ধুদের জানিয়ে রেখেছিলেন যে, একজন মস্ত ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর বাড়িতে আসতে পারেন যে কোনো সময়। তাই টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি জবাবি বার্তায় অনুরোধ জানালেন, স্বামীজী যেন সেদিনই ৪টা ২০ মিনিটের ট্রেন ধরে গুসভিন স্টেশনে আসেন। তিনি স্বামীজীর জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবেন। শ্রীমতী সানবার্ন জানতেন তাঁর দেবপুত্র আসবেনই। তবে একটা বিষয়ে তাঁর মনে একটু উদ্বেগ ছিল। দেবপুত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ এদেশের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং তাঁকে দেখে তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কেমন হবে কে জানে! কিন্তু স্বামীজী যখন ট্রেনটিকে নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে বেশি সময় দাঁড় করিয়ে রেখে বইভরা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে নামলেন তখন স্টেশনে উপস্থিত জনসাধারণ শ্রদ্ধানত পূজারির মতো রুদ্ধশ্বাস নীরবতায় তাঁকে গ্রহণ করেছিল। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।

দেড় সপ্তাহ স্বামীজী ম্যাসাচুসেটসে ব্যস্তভাবে কাটালেন। চারিদিকে এই বিস্ময়কর সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়ল।

খবর পেয়ে একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন অধ্যাপক রাইট। ইনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক, পুরো নাম জন হেনরি রাইট। সব বিষয়েই তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে তাঁকে 'বিশ্বকোষ' বলা হতো। তিনি ছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার সভাপতি ডঃ ব্যারোজের বন্ধু। অধ্যাপক যখন আসেন তখন স্বামীজী বাড়িতে ছিলেন না, কোনো কাজে বেরিয়েছিলেন। অধ্যাপক স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে গেলেন। কারণ, তাঁকে ৪০ মাইল দূরে আনিস্কোয়ামে ফিরতে হবে। কয়েকদিন পরে স্বামীজী অধ্যাপকের বাড়িতে গেলেন এবং পুরো একটা সপ্তাহ সেখানে রইলেন। বাড়ির সবাই তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে শ্রীমতী রাইট তাঁর মাকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি যত মানুষ দেখেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এই ভারতীয় সন্ন্যাসী।

সারা শহর স্বামীজীকে দেখার জন্যে তীব্র আবেগ বোধ করছিল। এই সময় এখানে একটি মজার ঘটনা ঘটে। এতে আমরা কৌতুকপ্রিয় স্বামীজীর পরিচয় পাবো। একদিন রাতে খাওয়ার পর রাইটের পড়শি অধ্যাপক ইউজেন ওয়ামবাগের ছোট্ট বাড়িতে সবাইকে নিয়ে গল্প করতে বসলেন স্বামীজী। ইংরাজদের সম্বন্ধে বললেন, 'ওরা এই সেদিন সামান্য কিছুক্ষণ আগেও অসভ্য ছিল। ওদের মেয়েদের আঁটসাঁট জামায় কীট-পতঙ্গ ঘুরে বেড়াত। ওদের গায়ে দারুণ দুর্গন্ধ ছিল।' একজন শ্রোতা এসব শুনে থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করে বলল, 'সে তো ৫০০ বছর আগের কথা।' স্বামীজী অমনি বললেন, তিনি তো মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বর্ণনা করছেন। সেখানে ৫০০ বছর কয়েক মুহূর্তের মতোই।

গলা আরো নামিয়ে মধুর স্বরে খুব শান্ত ভাবে বলে চললেন, 'ওরা পুরো বর্বর। ভয়ঙ্কর শীত, অভাব আর উত্তুরে হাওয়ার অত্যাচার ওদেরকে বুনো করে তুলেছে। ওরা শুধু হত্যার কথাই চিন্তা করে...ওদের আবার ধর্ম কোথায়? ওরা কি করে সেই পবিত্র মানুষটির নাম নেয়? খ্রীস্টের নাম নেয়? ওরা শুধু ওদের আত্মজনকেই ভালোবাসে, ধর্ম ওদের সভ্য করে তোলেনি, ওদের ক্ষুধাই ওদের সভ্য করেছে; ওদের ঈশ্বর নয়। ওদের মুখেই মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা, অন্তরে কিছু নেই, শুধু আছে বিষ ও সন্ত্রাস।' এমন করে ইংরাজদের ছবি ফুটিয়ে তুলতে তুলতে ভবিতব্যের ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তি একদিন ওদের উপর নেমে আসবেই। নারী-পুরুষ কেউ নিষ্কৃতি পাবে না। আবার নেমে আসবে অন্ধকার যুগ। ঈশ্বরের প্রতিহিংসা শীঘ্রই আসবে।' শ্রোতারা সবাই একসঙ্গে শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'শীঘ্রই!' 'হাজার বছরও লাগবে না', বলে স্বামীজী মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক্, যত তাড়াতাড়ি ভেবেছে তত্তটা নয়। তাদের জীবনকালটা ভালোয়-ভালোয় পেরিয়ে যাবে!

এইভাবে স্বামীজী রাইট-দম্পতি আর সেখানে যাঁরা জড় হতেন তাঁদের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। শ্রীমতী রাইট তাঁর মাকে আবার লিখে জানালেন, এ যেন যীশু খ্রীস্টের পুনরাগমনের মতো।

[চলবে]

ছবি : বিজন কর্মকার

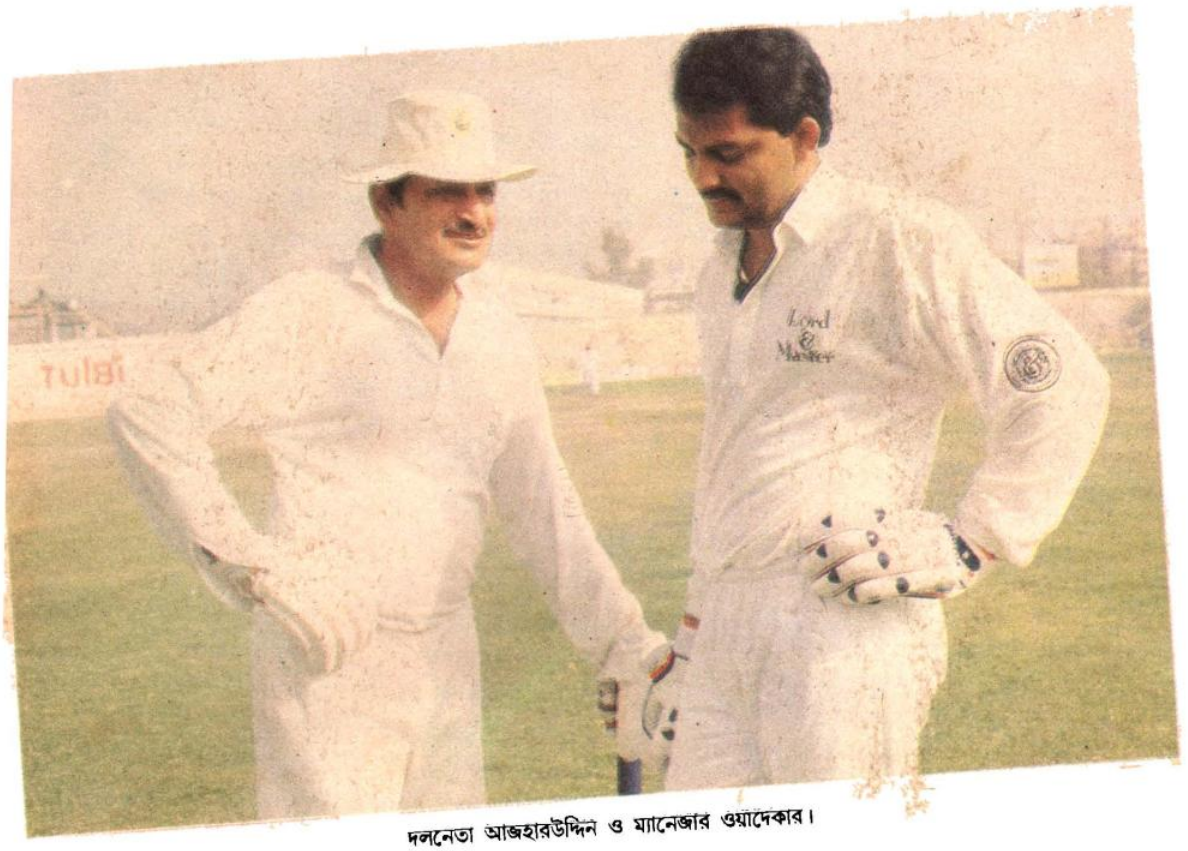

দলনেতা আজহারউদ্দিন ও ম্যানেজার ওয়াদেকার।

ক্রিকেটের ভরা মরশুম

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেট আর ফুটবলের আসর এখন জমজমাট। এই লেখা ছাপা হতে হতে হিরো কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। সি. এ. বি.-র হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বসছে হিরো কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর। তবে এই লেখা প্রেসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানের আসা অনিশ্চিত। বোম্বাই থেকে শিবসেনা হুমকি দিয়েছে, পাকিস্তান এলে তারা এই প্রতিযোগিতা বানচাল করে দেবে। এমনিতেই ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড খেলছে না। খেলার কথা ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা আর জিম্বাবুয়ের। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড তাদের ঘরোয়া মরশুম আর পরবর্তী টেস্ট মরশুমের দোহাই দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে আসেনি। এর ওপর পাকিস্থানও যদি না আসে তাহলে হিরো কাপের আকর্ষণ অনেকটাই কমে যাবে।

এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলো সারা ভারত জুড়ে হবে। দুটি সেমিফাইনাল আর ফাইনাল খেলা কলকাতায় হবে। নভেম্বর মাসের ৭ তারিখে শুরু হয়ে এই প্রতিযোগিতা ২৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে। সি. এ. বি. এই প্রতিযোগিতা আর তাদের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। দুর্গা পুজোর সময় ইডেন উদ্যানকে আলোর মালায় সাজানো ছিল তার প্রধান অঙ্গ।

এই ফাঁকে আমরা বরং একবার হিরো কাপের খেলার সূচীর ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। নভেম্বর মাসের ৭ তারিখে কানপুরে ভারত-শ্রীলঙ্কা খেলা দিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে। তবে তার আগের দিন কলকাতায় হিরো কাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সেদিন কোনো খেলা থাকবে না। নিচে হিরো কাপের খেলার সূচী দেওয়া হলোঃ

৭. ১১. ৯৩—ভারত : শ্রীলঙ্কা (কানপুর)

৮. ১১. ৯৩—পাকিস্তান : জিম্বাবুয়ে (মাদ্রাজ)

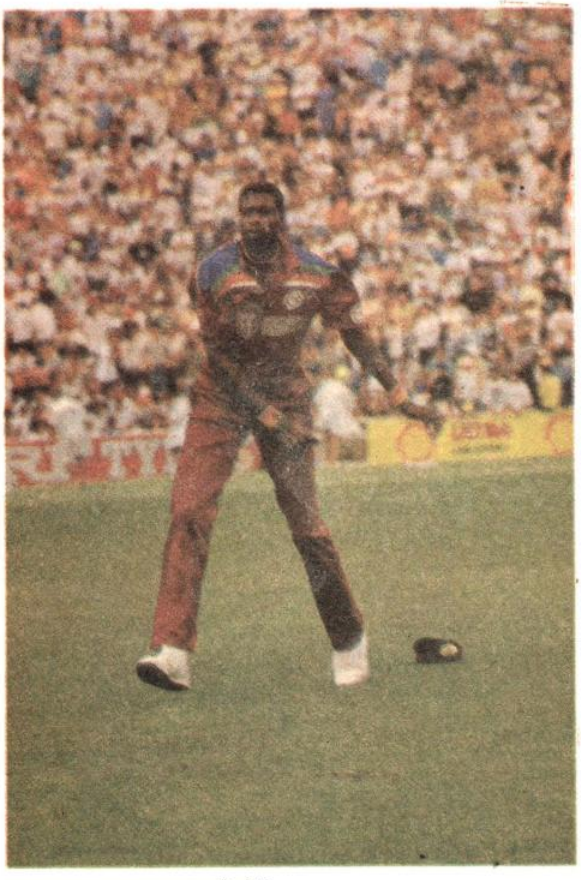

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যামব্রোজ

৯. ১১. ৯৩—ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কা (বোম্বাই-ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম)
১০. ১১. ৯৩—দক্ষিণ আফ্রিকা জিম্বাবুয়ে (বাঙ্গালোর)
১১. ১১. ৯৩—পাকিস্তান : শ্রীলঙ্কা (গোয়া)
১২. ১১. ৯৩—দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত (দিল্লি, দিন-রাত্রি)
১৩. ১১. ৯৩—বিশ্রাম
১৪. ১১. ৯৩—ওয়েস্ট ইন্ডিজ : দক্ষিণ আফ্রিকা (বোম্বাই-ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম)
১৫. ১১. ৯৩—শ্রীলঙ্কা : জিম্বাবুয়ে (পাটনা)
১৬. ১১. ৯৩—ভারত : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (আমেদাবাদ)
১৭. ১১. ৯৩—পাকিস্তান : দক্ষিণ আফ্রিকা (কটক)
১৮. ১১. ৯৩—ভারত : জিম্বাবুয়ে (ইন্দোর)
১৯. ১১. ৯৩—ওয়েস্ট ইন্ডিজ : পাকিস্তান (বিজয়বাড়া)
২০. ১১. ৯৩—দক্ষিণ আফ্রিকা : শ্রীলঙ্কা (গুয়াহাটি)
২১. ১১. ৯৩—ওয়েস্ট ইন্ডিজ : জিম্বাবুয়ে (হায়দরাবাদ, দিন-রাত্রি)
২২. ১১. ৯৩—ভারত পাকিস্তান (চণ্ডীগড়)
২৪. ১১. ৯৩—প্রথম সেমিফাইনাল, (কলকাতা, দিন-রাত্রি)
২৫. ১১. ৯৩—দ্বিতীয় সেমিফাইনাল (কলকাতা, দিন-রাত্রি)
২৭. ১১. ৯৩—ফাইনাল (কলকাতা, দিন-রাত্রি)
২৮. ১১. ৯৩—দরকার হলে ফাইনাল ম্যাচ চলবে।

এখন পাকিস্তান যদি না আসে তাহলে খেলার সূচী হয়তো বদলাতে হবে। এই লেখার সময় পর্যন্ত সব হালচাল দেখে মনে হয় পাকিস্তান আসবে না। শিবসেনা বলেছে তারা পাকিস্তানকে কিছুতেই খেলতে দেবে না। শিবসেনাদের হুমকির জন্য পাকিস্তান আগেও তাদের ভারত সফর বাতিল করেছে। এবারও তারা নিরাপত্তার পূর্ণ আশ্বাস চেয়েছে। সেই আশ্বাস উদ্যোক্তা এবং সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হলেও তারা শেষ পর্যন্ত আসবে বলে মনে হয় না। তখন ষষ্ঠ দল কোনটা হবে কিংবা অন্য কোন দলকে আনানো হবে তা একমাত্র উদ্যোক্তারাই জানেন। তবে সি. এ. বি.-র একটা সুবিধে হয়েছে এই প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা জগমোহন ডালমিয়া এবার সর্বভারতীয় ক্রিকেট সংস্থার সচিব হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনে আগে থাকতেই তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও এখন নিশ্চয়ই তা আরো অনেক বেড়েছে। তাই হয়তো তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পাকিস্তানের সমকক্ষ কোনো দলকে তিনি হিরো কাপের জন্যে এনে ফেলবেন। তবে এই লেখা ছাপা হতে হতে মনে হয় সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

হিরো কাপ দিয়ে ক্রিকেট মরশুম শুরু হচ্ছে। এর পর খেলার পর খেলা চলবে। টেস্ট ম্যাচও হবে। এবং কপিলদেব টপকে যাবেন নিউজিল্যান্ডের স্যার রিচার্ড হ্যাডলিকে। কিন্তু ৪৩১টি উইকেটের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেই কপিলদেব থামতে চান না। তিনি চান আরো দু-তিন বছর—অন্তত পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পর্যন্ত খেলতে। তাহলে তিনি চেষ্টা করবেন টেস্ট ক্রিকেটে পাঁচশ উইকেট দখলের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁকে কি সেই সুযোগ দেওয়া হবে? ভারতীয় ক্রিকেট কর্তাদের হাবভাব দেখে সে কথা তো মনে হচ্ছে না। ইতিমধ্যে প্রচার শুরু হয়ে গেছে কপিলের বলের ধার কমে গেছে। আগের মতো তিনি ব্যাট করতে পারছেন না। ফিল্ডিংও না। এই অবস্থায় কপিলকে আর বেশিদিন খেলানোর যুক্তি নেই বলে প্রচার করছেন এক সময়ের নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি আর বর্তমান বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজ সিং। এই রাজ সিং-এর জন্যেই মহিন্দর অমরনাথকে ভারতীয় দল থেকে সরে যেতে হয়েছিল। ভারতের ক্রিকেট কর্তাদের ওপর রাজ সিং-এর প্রভাব খুব। তাই মনে হচ্ছে তাঁর নজর যখন এবার কপিলদেবের ওপর পড়েছে তখন কপিলকে হয়তো বেশিদিন খেলতে দেওয়া হবে না। এ কথা ঠিক, কপিলের বলের ধার কমে গেছে, কিন্তু এখনো যা আছে

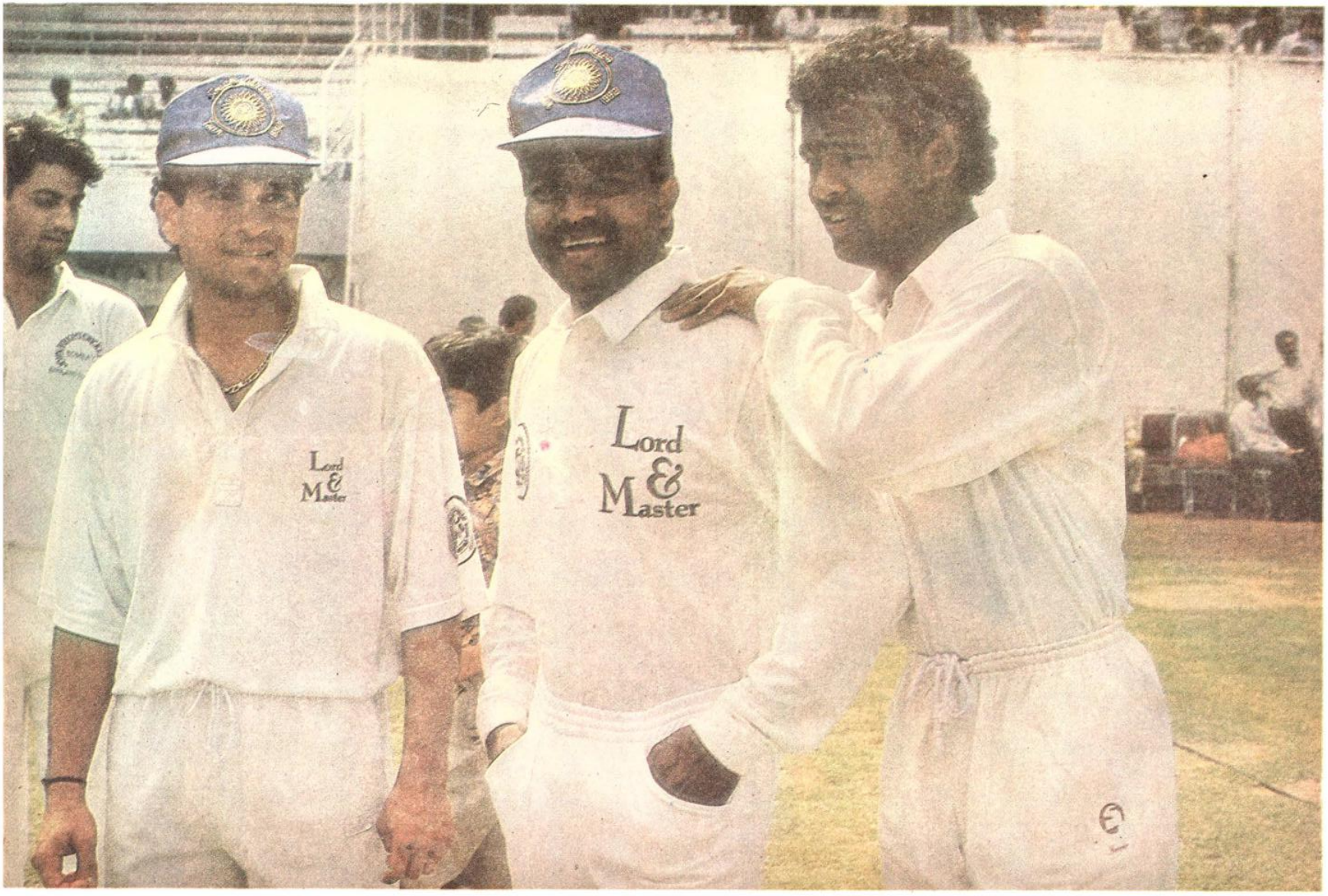

শচীন, আমরে ও কাম্বলি

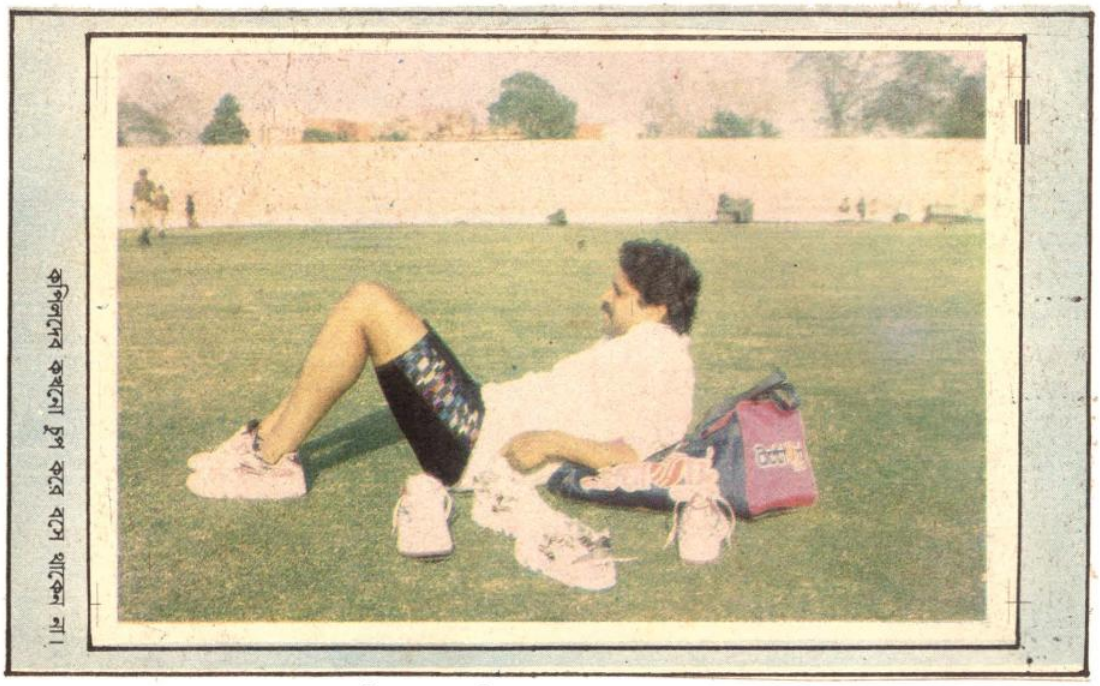

কপিলদেব কখনো চুপ করে বসে থাকেন না।

তাই বা ভারতে কজনের আছে? তা ছাড়া কপিল আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর উপস্থিতি প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। বিশ্বে এমন কোনো ব্যাটসম্যান নেই যিনি কপিলকে সমীহ করেন না। তাই মনে হয় কপিলদেবকে চট করে দলের বাইরে করে দেওয়া মস্ত বড় ভুল হবে।

এবার কলকাতার ফুটবল একেবারেই জমলো না। লীগের খেলাই তো এখনো শেষ হয়নি। তাই বিল্টু-মন্টু, নন্টে-ফন্টেদের খুব মন খারাপ। একদিনও ওদের খেলা দেখতে যাওয়া হলো না। তা খেলা হলোই বা কোথায়। অথচ এই বছর আই. এফ. এ. শতবর্ষে পা দিয়েছে। তার জন্যে নানা রকম উৎসব হয়েছে। খেলা-টেলাও হয়েছে। কিন্তু আসল যা সেই লীগের খেলাই এখনো ঠিকভাবে হলো না। আই. এফ. এ.-র কর্তারা অবশ্য বলছেন শীতকালে খেলিয়ে তাঁরা লীগ শেষ করে দেবেন। তাই কি সম্ভব! মাঠ কোথায়! দুর্গা পুজোর পরই তো প্রায় সব মাঠে ক্রিকেটের জন্যে পিচ তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। তা ছাড়া আই. এফ. এ. শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স, ডি. সি. এমের মতো সব প্রতিযোগিতা আছে। সেই সব প্রতিযোগিতায় কলকাতার বড় ক্লাবগুলো খেলবেই। তাহলে? এর মধ্যে লীগের খেলা চালানোর অবসর কোথায়? তাই হয়তো দেখা যাবে আই. এফ. এ.-র শতবর্ষের বছরে কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা পরিত্যক্ত হয়ে গেল। কে জানে? গত কবছর ধরে শীল্ডের খেলাও ঠিক মতো হচ্ছে না। এবার কি হবে? কে জানে! হলেও তো হবে সেই নমঃ নমঃ করে। ভারতের নামকরা দলগুলো যে এখন কিছুতেই আর কলকাতায় খেলতে আসতে চায় না। কেন কে জানে? এই ব্যাপারে আই. এফ. এ. যদি একটু নজর দিত তাহলে লীগের না হোক অন্তত শীল্ডের খেলা জমে উঠতো। কিন্তু তাও কি শেষ পর্যন্ত হবে? আই. এফ. এ.-র কর্তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিশ্বাস হতে চায় না যে! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়!

ভারতীয় দলের অধিনায়ক আজহারউদ্দিন।

গল্প নয় সত্যি

ঘুড়ি উড়োতে ভীষণ ভালবাসেন বিনোদ কাম্বলি। ঘুড়ি পেলে খেলাটেলা মাথায় ওঠে। ঘুড়ি উড়োতে শুরু করে দেন। বন্ধুর এই স্বভাবের কথা খুব ভালো করেই জানেন শচীন তেন্ডুলকার। তা জানার কথা। একই গুরুর কাছে ক্রিকেট খেলা শিখেছেন সেই ছোট থেকে। তাই বিনোদের স্বভাবের কথা শচীন তেন্ডুলকার জানবেন না তো কে জানবেন। বিনোদের ঘুড়ি উড়োতে ভালোবাসার কথা শচীনই সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। ঘুড়ি পাগল বিনোদের কথা বলতে গিয়ে শচীন বলেছেন, খেলার সময় আকাশে ঘুড়ি দেখলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। যদি অবশ্য তখন বিনোদের ব্যাটিং থাকে। আমি নিশ্চিত খেলা ভুলে বিনোদ তখন তাকিয়ে থাকবে আকাশের দিকে। একবার তো মাঠে এক কাণ্ড! আমি আর বিনোদ একসঙ্গে ব্যাট করছি। স্কুলের খেলা। তাড়াতাড়ি রান তোলার দরকার। দুজনে তাই তুলছিলাম। হঠাৎ দেখি মাথার ওপর একটা ঘুড়ি। ঘুড়ি দেখেই বিনোদের দিকে তাকালাম। ও যথারীতি খেলা ভুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললাম, ঘুড়ি পরে দেখো। এখন মন দিয়ে ব্যাট করো দেখি। বিনোদ কিছু বললো না, হাসলো। অবশ্য ব্যাটটা ভালোই করতে লাগলো। দেখতে দেখতে এক সময় দুজন সেঞ্চুরি করে ফেললাম। তারপরই হঠাৎ আমি থ। তাকিয়ে দেখি, একটা ঘুড়ি কেটে গিয়ে উড়তে উড়তে মাঠে এসে পড়েছে। আর সেই সুতো ধরে বিনোদ নিজের মনে ঘুড়ি উড়িয়ে চলেছে। ব্যাপারটা দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো ভেবে না পেয়ে ছুটে গেলাম বিনোদের কাছে। বললাম, একী করছো তুমি? খেলা চলছে জানো না। ঘুড়ির দিকে চোখ রেখে বিনোদ বললো, দাঁড়াও না ঘুড়িটা একটু উড়িয়ে নিই!

আমাদের সঙ্গে যে স্কুলের খেলা ছিলো সেই দলের খেলোয়াড়রা তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে বিনোদের দিকে। তাদের মজাও লাগছে খুব। অসহায় দুই আম্পায়ারও বুঝতে পারছেন না সেই মুহূর্তে তাঁদের কি করা উচিত। যাকে নিয়ে এতো কাণ্ড সেই বিনোদ কিন্তু তখন আপনমনে ঘুড়ি উড়িয়ে চলেছে। তার কোনো দিকেই খেয়াল নেই।

আমি ফিরে আসবোই

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর সঞ্জয় মঞ্জরেকারকে আর খেলানো হয়নি। অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ব্যর্থতার জন্যে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ সঞ্জয়কেই এক সময় ভারতীয় দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে ধরা হতো। তিনি ছিলেন তিন নম্বর ব্যাটসম্যান। তাঁকে অনেকে ভারতীয় দলের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবেও চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এখন সেই সঞ্জয় মঞ্জরেকারকেই ভারতীয় দলে ঢোকার জন্যে লড়তে হচ্ছে। সঞ্জয় এখন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছেন। চাইছেন একটা সুযোগ, শুধু একটা সুযোগ। একটা সুযোগ পেলেই তিনি প্রমাণ করে দেবেন নিজের যোগ্যতা। মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন ভারতীয় দলে। সঞ্জয় এখন নিজে কি ভাবছেন সেই কথাই শোনা যাক তাঁর নিজের মুখে।

প্রশ্নঃ তুমি কি আবার ভারতীয় দলে ফিরে আসার আশা রাখো?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই। আজ না হয় কাল আমি ভারতীয় দলে ফিরে আসবোই। নিজের যোগ্যতারও প্রমাণ দেবো। সব থেকে দুঃখের কথা হলো আজও আমি দেশের মাটিতে পুরো একটি টেস্ট মরশুম খেলার সুযোগ পাইনি। আমি বেশির ভাগ টেস্ট

ম্যাচই বিদেশে গিয়ে খেলেছি। সুনীল গাভাসকার, মহিন্দর অমরনাথ, সন্দীপ পাটিল বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আমাকে সুযোগ না দেবার জন্যে। নানা রকম পরামর্শ দিয়ে তাঁরা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। আমি জানি ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীরা চান আমি তাড়াতাড়ি দলে ফিরে আসি।

প্রশ্নঃ এইজন্যে কি তোমার কোনো মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তরঃ তা তো একটু হবেই। হাজার হলেও এই মরশুমটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে ভালো খেলতেই হবে। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে জাতীয় দলে ঢুকতে হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী ঠিকই, কিন্তু মানসিক চাপ তো একটু থাকবেই।

প্রশ্নঃ গত মরশুমে দেশের মাটিতে তুমি ইংলন্ড কিম্বা জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওনি। শ্রীলঙ্কা সফরেও ভারতীয় দলে তোমার স্থান হয়নি। ব্যাপারটা তোমায় নিশ্চয়ই কষ্ট দিয়েছিলো?

উত্তরঃ তা তো দেবেই। বিশেষ করে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনমে নব্বই-এর ওপর রান করার পর ভেবেছিলাম এবার আমাকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু হলো না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বিশাখাপত্তনমে ইংলন্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম গুচ আর ম্যানেজার কিথ ফ্লেচার বলেছিলেন, তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না আমি কি করে দলের বাইরে থাকি। আমায় দলে নেওয়া হয়নি বলে দুঃখ পেয়েছি ঠিকই কিন্তু এও বুঝতে পারি যে এখন একবার বাদ পড়লে দলে ঢোকা কতোটা কঠিন। আমায় তাই চেষ্টা করে যেতে হবে। আমি তাই করছি। যাতে সুযোগ এলে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি।

প্রশ্নঃ তুমি অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে খেলতে পারোনি কেন?

উত্তরঃ আমি সেইজন্যে আজও আপশোস করি। আমি খেলতে পারিনি। নিজের ইনিংস ঠিক মতো তৈরি করে নিতে ব্যর্থ হয়েছি। একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমি একভাবে কখনো আউট হইনি। আমি জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণটা রীতিমতো জোরদার। দক্ষিণ আফ্রিকাও যে নিজের দেশে কম যায় না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এ নয় যে এমন ধরনের বোলিং-এর বিরুদ্ধে আমি আগে খেলিনি। আসলে আমি ঐ সময় ঠিক মতো খেলতে পারিনি।

প্রশ্নঃ এখন তুমি কি করছো?

উত্তরঃ আমি বেশি জোর দিচ্ছি টেকনিকের দিকে। আমার লক্ষ্য দীর্ঘ ইনিংস খেলা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর বিশাখাপত্তনমের খেলাটা ছাড়া লম্বা ইনিংস বলতে যা বোঝায় আমি একটাও খেলিনি। আমি সব সময় নিজেকে বোঝাই যতক্ষণ পর্যন্ত না বোলারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছো দেখেশুনে সোজা ব্যাটে খেলে যাও। শুধু বোলারদের বুঝলেই হবে না, পিচটাকেও বুঝতে হবে। আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি, পিচ আর বোলারদের ঠিক ঠিক মতো বুঝতে পারলেই দাপটে খেলা যায়। আমি সেই চেষ্টাই করছি। এখন আছি সুযোগের অপেক্ষায়। একটা সুযোগ পেলেই যাতে আমি তাকে কাজে লাগাতে পারি তার জন্যে আমি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে নিজেকে তৈরি করে রাখছি। দেখি কতো দিনে সেই সুযোগ আসে।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

সন্দীপকুমার পণ্ডা (c/o নকুল চন্দ্র পণ্ডা, গ্রাম—নস্করদিঘি, পোস্ট—পাঁশকুড়া।

প্রশ্নঃ ভারতের কোন টেস্ট খেলোয়াড় বাংলায় লিখতে পড়তে পারেন?

উত্তরঃ যে কজন বাঙালী টেস্ট খেলেছেন তাঁরা তো পারেনই। অবাঙালীদের মধ্যে অরুণলালের মতো দুচারজনও বাংলায় কথা বলতে পারেন।

মহুয়া সিকদার, জয়শ্রী চ্যাটার্জি ও মানসী চন্দ্র (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুল, বর্ধমান)

প্রশ্নঃ এবার আমরা শচীন নয়, কাম্বলি নয়, কপিল নয়, আমরা জানতে চাই দাদুমণির রহস্য অর্থাৎ তিনি কে, তাঁর ছবি কি আমরা ভবিষ্যতে শুকতারায় দেখতে পাবো?

উত্তরঃ ইয়া বড় বড় গোঁফ দাড়ি। পেকে সাদা হয়ে গেছে। বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া দেহ, এমন একজনের ছবি দেখতে কি ভালো লাগবে? আমার তো মনে হয় রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেলে সব মজাই মাটি হয়ে যাবে। দাদুমণি দাদুমণিই। সকলের দাদুমণি। সেই তো ভালো। কি বলো?

সবচেয়ে দামী

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দামী ফুটবল খেলোয়াড় হলেন ইংলন্ডের ডেভিড প্লাট। প্লাট খেলতেন জুভেন্টাসে। প্লাট দুটি পজিশানে দুর্দান্ত খেলেন। মাঝমাঠে তিনি দারুণ খেললেও স্ট্রাইকার হিসেবেও তিনি তুখোড়। তবু গত মরশুমে তাঁর জুভেন্টাসের এক নম্বর দলে নিয়মিত জায়গা হয়নি। তাই এবছর তিনি জুভেন্টাস ছেড়ে সাম্পাদোরিয়ায় চলে গেলেন। আর দল বদল করতে গিয়েই তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়। জুভেন্টাস ছেড়ে সাম্পাদোরিয়ায় যাবার জন্যে তাঁর ট্রানসফার ফি লাগলো ১৭.৪ মিলিয়ন পাউন্ড। টাকার হিসেবে এক পাউন্ডের দাম পঞ্চাশ টাকার ওপর। এবার টাকার হিসেব করলেই আমাদের চোখ কপালে উঠে যাবে। তবে শুধু তো ট্রানসফার ফি-ই সব নয়। সাম্পাদোরিয়াকে প্লাটের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে। সেইজন্যই তো প্লাট বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়। সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন যে তিনি।

আবার মারাদোনা

দিয়েগো মারাদোনা সম্ভবত আবার আর্জেনটিনার জাতীয় দলে ফিরছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের মাঠে কলোম্বিয়ার কাছে ৫-০ ম্যাচে হেরে যাবার পর আর্জেনটিনার পরবর্তী বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে হলে তাদের এবার অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে। অক্টোবর মাসের ৩১ আর নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে খেলা দুটি হবে। এই ম্যাচ দুটিতে মারাদোনাকে খেলানোর জন্যে জনমত জোরদার হয়ে উঠছে। মারাদোনা এখন আর্জেনটিনার নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ ক্লাবের পক্ষে খেলছেন। আর্জেনটিনার কোচ আলফিও বেসিল সেই খেলা দেখে আশান্বিত। তবে এখনো মুখে কিছু বলেননি। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে মারাদোনা আবার আর্জেনটিনার জাতীয় দলে ফিরে আসছেন। নিউওয়েলস-এ খেলার জন্যে সই করার তিন সপ্তাহের মধ্যে মারাদোনা তাঁর ওজন ১২ কিলোগ্রাম কমিয়ে ফেলেছেন। ১৯৮৬ সালে তিনি যখন বিশ্বকাপে খেলেন তখন তাঁর ওজন যা ছিল এখন মারাদোনার ওজন তার চেয়েও কম। জাতীয় দলের পক্ষে খেলার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহও যথেষ্ট। তাই মনে হয় দিয়েগো মারাদোনা আবার আর্জেনটিনার জাতীয় দলে ফিরে আসছেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে

রাজপ্রাসাদ থেকে পথে নেমে এসেছেন টেনিসের রাজা বিয়র্ন বর্গ। এখন তাঁর অনেকটা ভিখারীর দশা। না আছে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ, না আছে খাওয়ার সংস্থান। পকেটে পয়সা নেই। সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। আজ যদি খেতে পান তো কাল খাওয়া জুটবে কিনা এই নিয়ে তাঁর চিন্তা। অথচ এক সময় খেলে এতো টাকা রোজগার করেছিলেন বর্গ যে গুনে শেষ করা যেতো না। আস্ত একটা দ্বীপই কিনে ফেলেছিলেন থাকার জন্যে। কিন্তু সবই গেছে। প্রথমে স্ত্রীর চিকিৎসা আর তারপর একটার পর একটা ব্যবসা করতে গিয়ে বর্গ আজ সব হারিয়ে বসেছেন। তিনি আজ একেবারে নিঃস্ব। খুব শীগগিরই হয়তো জানা যাবে, খাবার জোটাবার জন্যে বর্গ তাঁর দেশের স্যালভেশন আর্মির সুপ বিতরণ কেন্দ্রের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অন্য ভিখারীদের সঙ্গে। তাহলে তা হবে টেনিস জগতের পক্ষে সব থেকে লজ্জার দিন।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্নঃ

১) ভলাম্পকে ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ন কোন অ্যাথলিট ইথিওপিয়ার রাজপরিবারের বডিগার্ড ছিলেন?

২) বিশ্বে একজন মেয়েই দু দুবার এভারেস্ট জয় করেছেন। তাঁর নাম কি? কি করেন তিনি?

৩) গ্রাহাম গুচ ১৯টি সেঞ্চুরি করেছেন। ডবল সেঞ্চুরি একবারও না করলেও ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন একবার। কার বিরুদ্ধে?

৪) টেস্ট ক্রিকেটে আট হাজারের ওপর রান করেছেন আটজন ব্যাটসম্যান। দশ হাজারের ওপর দুজন। ঐ দুজনের নাম কি?

৫) ভারতের কোন ব্যাটসম্যান টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরিটি করেছিলেন ছক্কা হাঁকিয়ে?

৬) ইউসোবিও পর্তুগালের খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁর আসল দেশ কোথায়?

৭) টেনিস বলের রং হলুদ করা হলো কেন? কোন সাল থেকে হলুদ রংয়ের বলে খেলা হচ্ছে?

৮) ইংলন্ডের ফুটবল খেলোয়াড় গ্যারি লিনেকার এখন জাপানের গ্রামপাস এইট দলে খেলেন। ঐ ক্লাবের স্পনসর কোন কোম্পানি?

৯) সুনীল গাভাসকার কোথায় কোন সালে প্রথম টেস্ট খেলেন, কার বিরুদ্ধে?

১০) আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে আমেরিকায়। পুরো মার্কিন মুলুক ঘুরে ঘুরে এই প্রতিযোগিতার প্রচার চালানোর দায়িত্ব উদ্যোক্তারা কার ওপর দিয়েছেন?

উত্তর ঃ

১) আবেবে বিকিলা।

২) হরিয়ানার সন্তোষ যাদব। সন্তোষ ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার ফোর্সের একজন অফিসার।

৩) ভারতের বিরুদ্ধে।

৪) দশ হাজারের ওপর রান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার ও ভারতের সুনীল গাভাসকার।

৫) কপিলদেব।

৬) মোজাম্বিক থেকে ইউসোবিওর বাবা পর্তুগালে চলে আসেন।

৭) দর্শকদের দেখতে সুবিধে হয়। টিভিতে দেখানোরও সুবিধে। ১৯৮৬ সাল থেকে।

৮) টয়োটা মোটর কোম্পানি।

৯) ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে।

১০) বলের রাজা পেলের ওপর।

উক্তি

আমাদের ফিল্ডিং একটু অগোছালো। চাপের মুখে ব্যাটিংও ভেঙে পড়ে। তা যাতে না হয় তার জন্যে পরিকল্পনা মাফিক খেলা দরকার।

—মহম্মদ আজহারউদ্দিন

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

কপিলদেব তো এখন তার অতীতের ছায়া মাত্র। ব্যাটিং, ফিল্ডিং-এর রিফ্লেক্স হারিয়ে গেছে। বোলিং-এর সেই ছন্দও নেই। ওকে বাদ দেবার সময় হয়ে আসছে।

—রাজ সিং

(সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে)

আমি কতোদিন খেলবো সেটা কি রাজ সিং ঠিক করবেন? এ তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—কপিলদেব

(রাজ সিং-এর মন্তব্যের জবাবে)

আমার টেস্ট খেলোয়াড় জীবন একরকম শেষই হয়ে গেছে। আগেকার শক্তি ও সামর্থ্য এখন আর আমার মধ্যে নেই।

—ডেভিড গাওয়ার

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

আমরা খেলতে পারিনি বলে হেরেছি। ইচ্ছে ছিল ঐ জায়গাটার হদিস অন্তত পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনো কিছুই হলো না।

—লিয়েন্ডার পেজ

(ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫—০ খেলায় হেরে যাবার পর।)

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

উপহার

তন্ময় চক্রবর্তী

একটা দম দেওয়া লাট্টু, একটা রাক্ষসের মুখোশ, আর, আর...

কি? থামলি কেন? পরিতোষবাবু হেসে বলেন ছেলেকে, আর বুঝি কিছু মনে পড়ছে না নেবার মতো।

থাক, আর নাই দিতে হবে, এবার ন্যাজ গজাবে, টিটোর মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

কয়দিন হলো হরনাথপুরে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসেছে। তার ওপর আজ পরিতোষবাবুর ছেলে টিটোর জন্মদিন। আট পূর্ণ হয়ে ন'বছরে পা দিল টিটো। তার যত বায়নাক্কা বাবার কাছে। আজ সে রথের মেলায় যাবে। ছেলে খেলনার নাম মনে করতে পারছে না দেখে পরিতোষবাবু বললেন, তুই মনে কর, বিকেলে মেলায় গিয়ে কিনে দেব। স্নান করতে চলে গেলেন তিনি।

হরেক মাল দু-টাকায়... গরম জিলিপি... আসুন বাবু, এদিকে হরেক মজার জিনিস... নিজেদের পণ্যের প্রচারে ব্যস্ত দোকানীরা। ছোট্ট টিটো বাবা ও মায়ের হাত ধরে অবাক হয়ে দোকানগুলোকে দেখছিল। কত ছেলেমেয়ে জিনিস কিনে হাসিমুখে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। কেউ কেউ না পেয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে দোকানের দিকে। টিটো ভাবছে কতক্ষণে সে কিনবে দম দেওয়া লাট্টু!

পাখি নেবে খোকাবাবু? প্রায় কানের কাছে একটা লোক বলে ওঠে। টিটো ঘাড় ঘোরাতেই সে শুরু করে, এই এইটা ময়না, খাসা কথা কয়। ওটা বদরী, ওপাশের গুলো মুনিয়া...

অবাক হয় টিটো, পাখিও বিক্রি হয় মেলায়! সুন্দর পাখিগুলোকে খাঁচায় বন্ধ দেখে মন খারাপ হয়ে যায় তার, মেলার আনন্দটাই উবে যায় ওর মন থেকে। হঠাৎ টিটো বলে, বাবা, বাবা, পাখিগুলো কেনো না।

কি হবে? ওদের পুষলে মায়া পড়ে যায়, বলেন পরিতোষবাবু।

টিটো সাগ্রহে বলে, পুষব কেন? উড়িয়ে দেব আকাশে।

পাগল ছেলে! সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন তিনি। উড়িয়ে দিই না বাবা! তুমিই তো সেদিন বললে যে স্বামীজী

বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তবে আজ এ কথা বলছ কেন?

কি উত্তর দেবেন, কি বলে প্রবোধ দেবেন ছেলেকে বুঝে উঠতে পারেন না পরিতোষবাবু। তিনিই তো তাকে শিখিয়েছেন কখনো পশুপাখির উপর অত্যাচার করবে না, তাদের ভালোবাসবে।

বাবা, কেনো না ওগুলো, আকুলস্বরে টিটো মিনতি করে।

কিন্তু সোনা, অনেক খরচ হয়ে যাবে যে? এরপর আবার তোমার খেলনা কেনা রয়েছে। বুঝতে শেখো, মাসের শেষ এখন, মা বলেন টিটোকে।

খেলনা চাই না, পাখিগুলো কেনো, জোর দিয়ে বলে টিটো।

ছেলের জেদের কাছে হার মেনে দরদাম করে সাতটি পাখিই কিনে নিলেন পরিতোষবাবু। প্রতিটি পাখি টিটো নিজের হাতে আকাশে উড়িয়ে দিল এক এক করে। দূরের নীল আকাশে ওদের ডানা মেলা দেখলো অপলক নয়নে। ওর মুখে হাসি। জন্মদিনের অমূল্য উপহার ও পেয়েছে এই রথের মেলাতেই।

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

মেলার মজা

সমীর দেবনাথ

বাবা, বাবা, আমি কাল তোমার সঙ্গে রথের মেলা দেখতে যাব, আবদার করল দশ বছরের ছোট্ট টুকাই।

বেশ তো। বললেন টুকাইয়ের বাবা রতনবাবু।

বাবার আশ্বাস পেয়ে ছেলের আনন্দ আর ধরে না। সে

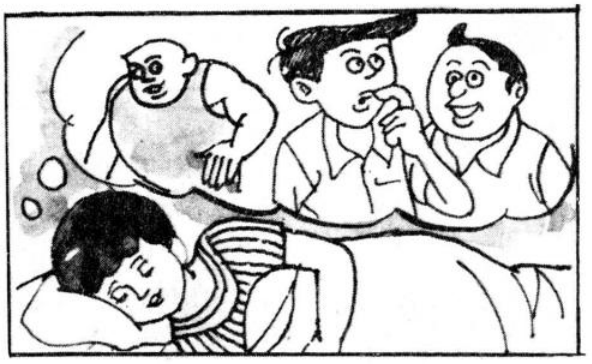

চিন্তা করে, রথের মেলা দেখতে তো কতো লোক আসে, যদি এই মেলায় বাঁটুল, দুটো বিচ্ছু, হাঁদা-ভোঁদা আর বাহাদুর বেড়াল আসে কি মজাই না হয়! তাহলে সে তাদের সঙ্গেই সারা মেলা ঘুরবে। চিন্তা করতে করতে টুকাই কখন যে তার কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে গেছে তা সে নিজেই জানে না। সে দেখে সত্যিই বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, বিচ্ছু দুটি ও বাহাদুর বেড়াল মেলা দেখতে এসেছে আর সে ওদের সঙ্গেই মেলায় ঘুরছে।... তারা এবার রথের দড়ি ধরে রথ টানছে। পিছন থেকে বিচ্ছু দুটো সুযোগ বুঝে তার চুল ধরে টান মারে। সে যেই বিচ্ছু দুটোকে ধরতে গেল অমনি তারা যে কোথায় অদৃশ্য হলো, ভিড়ের মধ্যে সে খুঁজেই পেল না।... রথ টানা শেষ হলে ওরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজা খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলো, এবার পয়সা দেবার পালা। কিন্তু কারো পকেটে একটিও পয়সা নেই। কোথা থেকে পয়সা দেবে এই নিয়ে যখন সবাই চিন্তিত তখন মার ডাকে টুকাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা বললেন, কখন থেকে ডাকছি তবু ওঠার নাম নেই। নাও ধরো, বলে দুধের গ্লাসটা টুকাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মা চলে গেলেন।

টুকাই দুধের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবে, সে কখন মেলায় গেল, আর কি ভাবেই বা গেল? সে যে পঙ্গু, চলতে পারে না। তাহলে যা দেখেছে সবটাই তার কল্পনা। তা হোক, তবু তো সে বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, বিচ্ছুদের ও বাহাদুর বেড়ালের সঙ্গে মিলে রথের মেলার যে মজা উপভোগ করেছে তা কেউ কখনো করতে পারবে না। সে আনন্দের মজাই আলাদা।

ছবিঃ সুচি

এঁদের লেখাও ভালোঃ
অপর্ণা দাস (শিলিগুড়ি)॥ পার্থপ্রতিম লোধ (ফুলছড়ি, উত্তর ত্রিপুরা)॥ জুমিলা নিয়োগী (ভবানীপুর, কলকাতা-২৫)॥ জয়ন্ত সাহা (বিধান সরণী, কলকাতা-৬)॥ তিমিরবরণ চঁদ (গুসকরা, বর্ধমান)॥ চন্দা দাম (শিববারি রোড, আসাম)॥ সন্দীপন চক্রবর্তী (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)॥

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের মালিক সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতামহ নিতাইলাল সাহার স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু
নবান্ন

৺নিতাইলাল সাহা
মৃত্যুঃ ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ পৌষ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার চৈত্র সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার—১০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার—৫০ টাকা।

সৌজন্যেঃ আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন
১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০০১৯

ভয় থেকে ভূত

তুষার সরদার

কাকামণি, এবার কিন্তু একটা ভূতের গল্প!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাকামণি, ভূতের গল্প। বিলু আর মিলু একসঙ্গে সায় দিল দিদি টুম্পার কথায়।

প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যায় ওদের পড়াশুনা থেকে রেহাই, আর আমার কাছে গল্প শোনার দিন। সন্ধ্যের দিকে তিনটে গল্প শোনা হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর আরো একটা গল্প পাওনা আছে তিন ভাই বোনের।

আচ্ছা, তাই হবে। বসো সবাই চুপটি করে। আমারই ছোটবেলার একটা ঘটনা বলছি তোমাদের। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। ভীষণ দুরন্ত ছিলাম আমি। বাড়িতে সেজন্য বকাঝকা কম খেতে হতো না। এই দুরন্তপনাই একদিন আমাকে দারুণ বিপদে ফেলেছিল। সেই ঘটনাটাই বলবো তোমাদের।

আমার মামার বাড়ি যে অঞ্চলে ছিল সেখানকার একটা স্কুলে আমি ছোটবেলায় পড়তাম। থাকতাম বোর্ডিংএ। গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটিতে বাড়ি যেতাম। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আর বাড়ি আসিনি। পড়াশোনার সুবিধার জন্য বোর্ডিংএ থেকে গিয়েছিলাম।

বোর্ডিং থেকে মাইল দেড়েক পুব দিকে খুব বড় একটা শ্মশান ছিল। বহু দূর দূর থেকে লোকে সেখানে মড়া পোড়াতে আসতো। এই শ্মশানের কিছুটা দূরে, ছিল একটা বিরাট সমাধিক্ষেত্র। নানারকম গাছপালার জঙ্গলে ভরা সমাধিক্ষেত্রটাকে সবাই যজ্ঞিবাড়ি বলতো। যজ্ঞিবাড়ির একপাশে ছোট কুঁড়েতে থাকতো সন্ন্যাসী ঠাকুর আর সন্ন্যাসী ঠাকরুন। ওঁদের ঘরে কালীমূর্তির আশেপাশে কয়েকটা মড়ার মাথা সাজিয়ে রাখা থাকতো।

যজ্ঞিবাড়ির ভূত নিয়েই একদিন আমরা তিন বন্ধু কথা কাটাকাটি করছিলাম। তিন বন্ধু বলতে আমি, নন্তে আর কালু। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ভূত শুধুমাত্র মনের দুর্বলতা আর ভুল বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। তাই ভূতের ভয় আমার একেবারেই ছিল না। এই নির্ভীকতাটা শেষে অহঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য কারো সাহস আছে শুনলে তাকে ভয় পাইয়ে নাস্তানাবুদ না-করা পর্যন্ত আমার শান্তি হতো না। আমার দুষ্ট বুদ্ধিটা সেদিনও মাথাচাড়া

বটগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম।

দিয়ে উঠলো। যখন নন্তে কথায় কথায় কালুকে বললো, ওসব যজ্ঞিবাড়ির ভূতফুত আমায় দেখাস না কেলো। কেননা আমি গাঁজাটাজা একেবারেই খাই না, বুঝলি!

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই তোর ভূতের ভয় নেই নন্তে?

না মশাই, না। ভূত থাকলে তবে তা ভূতের ভয় থাকবে।

কালু একটু শঙ্কিত গলায় বললো, তেনাদের নিয়ে অমন তাচ্ছিল্য করিস না নন্তে। কোনদিন খুব ঝামেলায় পড়ে যাবি।

নন্তে রেগে তেড়েফুঁড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে থামিয়ে বললাম, আচ্ছা বেশ, তোর সাহসের তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক। আজ রাতে তুই যজ্ঞিবাড়িতে যেতে পারবি?

ফুঃ! এই কথা, বল কটার সময় যেতে হবে?

আমি একটু ভেবে বললাম, আমাদের আগেকার রাঁধুনি ভোম্বলদা আত্মহত্যা করলে আমরা তাকে যে জায়গাটায় সমাধি দিয়েছিলাম সেই জায়গাটা তোর মনে আছে?

হ্যাঁ। এই তো গত বছরের কথা। মনে থাকবে না কেন? পশ্চিমের সেই মস্ত বটগাছটার তলাতেই তো ওকে পোঁতা হয়েছিল।

বেশ। তুই আর বিশু ছুরি দিয়ে সেই গাছটার যে মোটা ডালটায় ভোম্বলদার নাম খোদাই করে দিয়েছিলি সেটা এখনও চিনতে পারবি?

খুব পারবো। গতমাসেই একবার যজ্ঞিবাড়িতে গিয়েছিলাম। নামটা এখনও আছে, কিন্তু হঠাৎ ডালপালা, নাম এসব নিয়ে পড়লি কেন?

এবার বলছি শোন। আজ রাত বারোটায় তোকে যজ্ঞিবাড়িতে যেতে হবে। প্রমাণ হিসেবে তোকে সেই ডালটায় ভোম্বলদার খোদাইকরা নামটার উপর একটা পেরেক ঠুকে দিয়ে আসতে হবে। অবিশ্যি যদি পারিস শেষ পর্যন্ত।

এই কথা। যদি পারি কী বাজি থাকবে?

দশ টাকা। ভয় পেলে তোকে দিতে হবে। ভয় না পেয়ে পেরেক টুকে ফিরে আসতে পারলে আমি দেব। আর হ্যাঁ, রাত বারোটার পরে তোকে বেরুতে হবে।

ঠিক আছে। আলো নিয়ে যাবো কিন্তু আমি।

কালু বলে উঠলো, তাহলে ওনারা সরে যাবেন। তখন বাচ্চারাও যেতে পারবে ওখানে।

আমি বললাম, না, না, নিয়ে যাস আলো। তবে টর্চ নয়, হ্যারিকেন নিয়ে যেতে হবে তোকে।

তাই সই। তাহলে আজই যাচ্ছি। তুই টাকাটা যোগাড় করে রাখিস।

আগে তুই পেরেক ঠুকে ফিরে আয় তো।

আমরা যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। নন্তেটার সাহস আছে। আর ভূত যখন নেই, তখন ও পেরেক মেরে ফিরে আসতে পারবে। ঠিক আছে, নাই বা থাকলো ভূত। ভূত হতে কতক্ষণ। আমিই সাজবো ভূত। হ্যারিকেনের আলোতে খুব দৃষ্টিভ্রম ঘটে, নকল ভূত ধরা অসম্ভব। দেখি ওর সাহসের দৌড়।

রাত এগারোটা নাগাদ আমি কয়েকটা দরকারী জিনিস সাইডব্যাগে পুরে এক হাতে একটা বড় টর্চ আর অন্য হাতে পাকা বাঁশের একটা লাঠি নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম যজ্ঞিবাড়ির উদ্দেশে। নন্তের আগেই আমাকে পৌঁছুতে হবে।

বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে আমি মাঠের পথ ধরলাম। মাঠ দিয়ে যেতে কষ্ট হবে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে গেলে নন্তেটার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া দূরত্বও কিছুটা কম হবে। সেদিন বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কী নবমী হবে। আধখানা তামাটে চাঁদটা আকাশ বেয়ে দূরে যজ্ঞিবাড়ির গাছপালার আড়াল থেকে একটু ওপরে উঠেছে। অল্পস্বল্প ম্লান আলো, নির্জন সুনসান মাঠ, রাতচরা পাখির চিৎকার, আমার চারপাশে কেমন যেন গল্পে পড়া ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করছিল। যদিও এরকম রাতের অভিযান এই প্রথম নয়, তবুও সে-রাতে একটু অন্যরকম লাগছিল। যা হোক, আধঘন্টার মধ্যেই আমি যজ্ঞিবাড়ির দক্ষিণ দিকে এসে পৌঁছুলাম।

নন্তে নিশ্চয়ই এখনও এসে পৌঁছয়নি। বারোটা নাগাদ ওর আসার কথা আছে। তবুও সতর্ক হয়ে এগুতে লাগলাম। যদি

ও এসে থাকে আর আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সব মতলব ভেস্তে যাবে আমার। টর্চ না জ্বেলে এগোতে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছি। খুব সাবধানে পা ফেলে ধীরে ধীরে আমি নির্দিষ্ট বটগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম।

গাছটা বেশ বড় আর ঝাড়ালো। ঝাপসা চাঁদের আলো এখানে প্রায় ঢুকতে পারেনি বললেই হয়। চারপাশে ঝিমধরা স্তব্ধতা। খানিক দূর থেকে শিয়াল আর কুকুরের বীভৎস চীৎকার কানে আসছে। মস্ত উঁচু পাকুড় গাছের ওপর থেকে শকুনের বাচ্চা ডাকছে, ঠিক যেন কোনো শিশুর কান্নার মতো। সব মিলিয়ে একটা গা-ছমছম করা পরিবেশ।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ মাথার ওপর একটা প্যাঁচা বিশ্রী কর্কশ চীৎকার করে উঠতেই ছ্যাঁৎ করে আমার চমক ভাঙলো। টর্চের আলোতে হাতঘড়িতে দেখলাম বারোটা কুড়ি। নন্তে যে কোনো সময় এসে পড়বে। আমি ব্যাগ থেকে একটা ধুতি বের করে মাথা ঢেকে জড়িয়ে নিলাম। মাথাটা বিরাট বড় দেখাচ্ছে এবার। তারপর দুটো লম্বা দড়ি বের করে পায়ের গোড়ালিতে শক্ত করে বেঁধে নিলাম।

কেন কাকামণি? বিলু থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

আমি ঠিক করেই এসেছিলাম ওই দড়ি দুটোর অন্য দিক গাছের ডালে শক্ত করে বাঁধবো। তারপর নন্তে যখন গাছের ডালে পেরেক ঠুকবে তখন মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে পড়ে ছটফট করতে করতে বিকট আওয়াজ করব। নন্তে যত সাহসীই হোক, ভয় ওকে পেতেই হবে।

তৈরি হয়ে নিয়ে আমি গাছে উঠতে যাব এমন সময় দেখি যজ্ঞিবাড়ির উত্তর দিক থেকে একটা মিটমিটে হ্যারিকেনের আলো এগিয়ে আসছে। নির্ঘাৎ নন্তে আসছে। আর দেরি নয়। আমি গাছে উঠতে শুরু করলাম।

খানিকটা ওপরে উঠতে সেই ডালটার কাছে এলাম। আমি এর ওপর দিয়ে উঠবো। এই ডালের গোড়ার দিকে ভোম্বলদার নাম খোদাই করা আছে। মনটা যেন কেমন করে উঠলো। ভোম্বলদার মরা বিকৃত বীভৎস মুখটার কথা মনে পড়লো। নিজের অজান্তেই গা-টা একটু শিরশির করে উঠলো। বুঝলাম আমি ভয় পেতে চলেছি। সাবধান হলাম। মনের দুর্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে উপরের ডালটায় তরতরিয়ে উঠে গেলাম।

নন্তে তখন গাছতলায় এসে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি। হ্যারিকেনটা হাতে করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে। দাঁড়াও বাছাধন, দেখাচ্ছি মজা একটু পরেই। আমি সুবিধামত একটা ডাল খুঁজতে লাগলাম যাতে ঠিকমত ঝুলে থাকা যাবে। সামনে একটু উঁচুতে একটা ডাল পছন্দ হলো। চাঁদের তামাটে ভাবটা এখন কিছুটা কমে গেছে। এখানে ওখানে পাতার ফাঁকে আলো এসে পড়েছে। ফলে অন্ধকারটা ওপরের দিকটায় বেশ ফিকে। সন্তর্পণে ডালটায় পৌঁছে আমি নিচের দিকে চাইলাম।

নন্তে এবার গাছে উঠতে শুরু করেছে। নন্তে যে ডালে পেরেক পুঁতবে, আমি সেই ডালটা থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট

একটা আলো এগিয়ে আসছে।

ওপরে আছি। পায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়ি দুটোর অন্য প্রান্ত সবে ডালে বাঁধতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো ডালটার শেষ প্রান্তের দিকে একটা ঝুলন্ত সাদা জিনিস, ঠিক যেন মানুষের মতো। কী ওটা!

তীব্র কৌতূহলে তরতর করে ডাল বেয়ে একেবারে সেটার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর—তারপর সেটার দিকে ভালো করে চাইতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম একটা কঙ্কাল গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। কোমর থেকে একটা সাদা কাপড় পরা আছে। মাথার সাদা খুলির ওপর পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দুটো কালো কালো গর্তের ভয়ঙ্কর চোখ। নাকের জায়গায় একটা বীভৎস গর্ত। দুপাটি হিংস্র চোয়াল। ঘাড়টা একপাশে একটু বেঁকে আছে। তাতে শক্ত হয়ে এঁটে আছে দড়ির ফাঁসটা।

থরথর করে পাতার মতো কাঁপছিলাম আমি। পালিয়ে যে নিচে নেমে যাবো তাও পারছিলাম না। পা দুটো যেন কেউ ডালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে সেঁটে দিয়েছে। হঠাৎ কঙ্কালটা দুলতে থাকলো। খটখট করে হাড়গুলো বেজে উঠলো। আর তারপর দুটো হাত লম্বা করে বাড়িয়ে সেটা হিংস্রভাবে এগিয়ে এলো

খিদে পেলে বই খায়

বিরাম মুখোপাধ্যায়

খিদে পেলে বই খায় উপোসী পাঠক,
ঘুম পেলে ঘুম কাড়ে ঝাল মিঠে টক।
গোয়েন্দা কী ভূতপ্রেত তাজা চানাচুর
কল্পবিজ্ঞানেও তৃপ্তি-ঢেকুর।

খিদের কি শেষ আছে, কী দিয়ে মেটাই!
চকোলেট জিভে ক্ষীর ছড়ার মেঠাই।
মজাদার কাহিনীর চাক-ভাঙা মউ
বুঁদ হয়ে গেলে ছেলে বুড়ো বুড়ি বউ।

বেশি খিদে বেশি বই বাছাই বিচার—
সকালের শুকতারা ঈথার-বিথার।।

ছবি : সুফি

আমাকে ধরতে।

আর পারলাম না। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে নিচে পড়ে গেলাম। জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগে খুব অস্পষ্টভাবে আমার কানে এসে বাজলো আর একটা আর্তনাদ।

দম নিতে একটু থামলাম আমি। বিলু মিলু সমস্বরে বলে ওঠে, তারপর—কাকামণি—তারপর ?

তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখি আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কুটিরের দাওয়ায় শুয়ে আছি। মাথা মুখ জলে ভেজা সপসপে। জলের ঘটি হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে আমি উঠে বসলাম। দেখি দাওয়ার ওপাশে নন্তে শুয়ে। ঠাকরুন তাকে বাতাস করছেন। খানিক পরে নন্তের জ্ঞান ফিরে এলো। কৌতূহলী সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে সব কিছুই খুলে বলতে হলো। শুনে উনি প্রথমে হাসলেন তারপর খুব বকলেন। আমি নাকি একটা বনকলমির ঘন ঝোপের উপর পড়েছিলাম। নইলে হাত-পা নিশ্চয়ই ভাঙতো। নন্তে বললো সে পেরেক ঠুকে নেমে আসছিল। আমার আচমকা চীৎকার আর পড়ে যাওয়া দেখে সেও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায়। অবশ্য স্বীকার করলো আগে থেকেই সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাদের চীৎকার শুনে সন্ন্যাসী খোঁজ করতে এসে আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে যান।

কিন্তু, সেই—সেই গাছের ভূতটা কাকামণি ?

মিলুর রুদ্ধশ্বাস প্রশ্নে আমি হেসে বললাম, ওটা ভূত নয় মোটেই। ওটা আসলে একটা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়। ওটার কথাও সন্ন্যাসী বললেন। ওই বটগাছে একবার বুনো কুমড়ো গাছ উঠেছিল। প্রচুর কুমড়ো ফলতো। কিন্তু ইঁদুরে সব কেটে দিত। তাই একটা কঙ্কালের আধখানা কুড়িয়ে পেয়ে ওইখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কোমরের কাপড়টা তিনিই বেঁধে দিয়েছিলেন। কঙ্কালের সঙ্গে খুব লম্বা একটা দড়ি বেঁধে দেওয়া ছিল। দড়ির অন্য প্রান্ত ছিল কুটিরের দাওয়ার খুঁটিতে বাঁধা। দড়িটা এমনভাবে বাঁধা ছিল যে ওটা টানলে কঙ্কালটা দুলবে, হাত দুটো ওঠানামা করবে আর খটখট আওয়াজ হবে। তাতে ইঁদুর ভয় পাবে। কুমড়ো গাছটা কিছুদিন হলো মরে গেছে। কিন্তু কঙ্কালটা আর নামানো হয়নি। আজ রাতে হঠাৎ কী মনে করে সন্ন্যাসী ঠাকরুন দড়িটা টেনে কঙ্কালটা আছে কী না দেখছিলেন। আর তাইতেই সেটা অমন করে আমার দিকে দুলতে দুলতে এগিয়ে গিয়েছিল। গাছের ওপর আলো-আঁধারিতে এসব বোঝা খুব অসম্ভব ছিল।

বাজির টাকা কে দিল কাকামণি ? টুম্পা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

নন্তে দিয়েছিল। তবে পাঁচ টাকা। বলেছিল, তুই ভূত সেজে ভয় দেখাবি এ কথা তো শর্তে ছিল না। তাই পাঁচ টাকা জরিমানা কেটে নিলাম।

ছবি : সুফি

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ—

১। সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম কারা প্রথম ব্যবহার করে?

২। গাড়ির কোন অংশটি ১৮৪৫ সালে আবিষ্কৃত হয়ে আবার ১৮৮৮ সালে পুনঃআবিষ্কৃত হয়?

৩। সার্কাসে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখানো হয়। এ ধরনের সার্কাস কে প্রথম শুরু করেন?

৪। ছাপ্পান্ন বছরের মধ্যে কার লেখা ছেষট্টিটি রহস্যের বই প্রচুর বিক্রি হয়?

৫। নিউইয়র্ক শহরের নাম প্রথমে কি ছিল?

৬। ইনভিজিবিল ম্যান কার লেখা?

৭। পল্লব রাজাদের মধ্যে মহামল্ল নামে কে বিখ্যাত হয়েছিল?

৮। বক্সাইট, হেমাটাইট, ক্রোমাইট আর অ্যান্থ্রাসাইটের মধ্যে কোনটিকে একধরনের কয়লা বলা চলে?

উত্তর ঃ—

১। রোমানরা।

২। হাওয়া ভরা চাকা। ১৮৪৫ সালে রবার্ট উইলিয়াম থমসন দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও সকলে এই আবিষ্কারের কথা ভুলে যায়। ১৮৮৮ সালে জন বয়েড ডানলপ আবার এটি পুনঃআবিষ্কার করেন।

৩। বহু কাল আগে থেকেই লোকে জাগলিং, অ্যাক্রোব্যাটিস ও ঘোড়ায় চড়ার নানান চমকপ্রদ খেলা দেখাত। কিন্তু সে সবই তাদের বিশেষ একটি খেলারই প্রদর্শনী হতো। অনেকের মতে আধুনিক কালে যে ধরনের সার্কাস দেখান হয় তা প্রথম শুরু করেন ফিলিপ অ্যাস্টলি নামে এক ইংরেজ। ইনি ছিলেন এক দক্ষ ঘোড়সওয়ার। সার্কাস যে গোল বৃত্তের মধ্যে হয় সেটা তাঁরই আবিষ্কার, কারণ তিনি দেখেন যে ঘোড়া গোল হয়ে ছুটলে তার পিঠে খুব সহজেই ব্যালেন্স করা যায়। ১৭৬৮ সালে প্রথম সার্কাস খোলার পর ক্রমে দড়ির ওপর হাঁটা, অ্যাক্রোব্যাটিস ও ক্লাউনদের তামাসা দেখানোও তিনি এতে সংযোজন করেন। এইভাবেই আধুনিক কালের সার্কাস শুরু হয়।

৪। আগাথা মেরি ক্লারিসা ক্রিস্টি।

৫। ১৬২৬ সালে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে ম্যানহাটান আইল্যান্ড কিনে নিয়ে ডাচরা নিউইয়র্ক শহরের গোড়াপত্তন করে। তারা এর নাম রাখে নিউ অ্যামস্টারড্যাম। ওই অঞ্চলের ইংরেজদের এটা পছন্দ হয় না। স্বদেশে সাহায্য চাইল জেমস্, ডিউক অফ ইয়র্ক ১৬২৭ সালে এক নৌবাহিনী পাঠান। ভয় পেয়ে ডাচরা শহরটি ইংরেজদের হাতে তুলে দিলে ডিউক অফ ইয়র্কের সম্মানে শহরের নাম রাখা হয় নিউইয়র্ক।

৬। এইচ. জি. ওয়েলস।

৭। প্রথম নরসিংহ বর্মন।

৮। অ্যান্থ্রাসাইট।

ছবি: সুফি

দুষ্টু লোরার গল্প

আরতি বসু

বুক টিপটিপ করছে রোয়েনার। অ্যান্ড্রু আঙ্কলের বাড়িতে যে আজ কী হবে কে জানে! নামজাদা এক গাইয়ে আর এক বাজিয়ে আসবেন। অনামা শিল্পীও থাকবেন দু চারজন। তার মধ্যে কিনা তার লোরা! তার ওপর লোরা নাকি আজকের আসরের শেষ শিল্পী! অতক্ষণ ওকে চুপ করে বসিয়ে রাখা যাবে তো? খুব সন্দেহ আছে রোয়েনার। গান-বাজনার ব্যাপারে লোরাটা ভয়ঙ্কর হিংসুটে। কিছুতেই কাউকে গাইতে দিতে চায় না। এখন ভালোয় ভালোয় সন্ধোটা কাটলে হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি সে লোরাকে বোঝাচ্ছে, একদম দুষ্টুমি করবে না। লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন? নইলে কিন্তু তোমার আমার দুজনেরই নিন্দে হবে খুব।

বলছে বটে তবু ভয় যাচ্ছে না। সেই প্রথম যেদিন ও লোরাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন যেমন ভয় করছিল আজও ঠিক সেই এক অবস্থা। ক'দিন আর? এই তো মাত্র মাস আষ্টেক আগের কথা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও বিকেলে ও বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিল খাড়ির ধারে। ওখানেই দেখা হলো এক মৎস্যব্যবসায়ীর সঙ্গে। মাছধরার নৌকোটা পাড়ে ভিড়িয়ে ভদ্রলোক কী যেন করছেন খুব মন দিয়ে। কৌতূহলী রোয়েনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। কচি একটা সীলের বাচ্চা অবলীলাক্রমে রোয়েনার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বোধহয় ঘূর্ণিঝড়ে মায়ের কাছ থেকে ছিটকে গেছে। এখানে পড়ে থাকলে মরে যাবে। তুমি একে বাড়ি নিয়ে যাও। একটু বড় হলে জলে ছেড়ে দিও। বলেই ভদ্রলোক দিব্যি নৌকোর দড়ি খুলে ভেসে চলে গেলেন গভীর সমুদ্রে।

রোয়েনা তো হতভম্ব। কী করবে এখন? একে বাড়ি নিয়ে গেলে যদি পিসি বকে? যদি বলে, বাড়িতে কতগুলো পুষি, তার ওপর আবার একটা জোটালে? যদি বলে, না বাপু, একে রাখা চলবে না, বিদেয় কর? কী হবে তাহলে? এদিকে সন্ধে হয়ে এল। হাওয়ার জোর বাড়ছে। কোলের মধ্যে ছোট্ট ছানাটা ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। কুঁই কুঁই করে ক্ষীণ শব্দও করছে একটু। রোয়েনা তাড়াতাড়ি ওকে ভাল করে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর পা বাড়াল বাড়ির দিকে। দু পা যায়, আর একবার থমকে দাঁড়ায়। ভয়ে ভাবনায় কান্না পাচ্ছে তার।

শুকনো মুখে বাড়ির দরজায় পা দিতেই পিসির সামনে পড়ল। ওর মুখ চোখের চেহারা দেখে পিসি মিরিয়ন তো অবাক, কী রে? কী হয়েছে? তোর মুখ চোখ অমন কেন? উত্তরে রোয়েনা শুধু নিঃশব্দে ছানাটাকে বুকের মধ্যে থেকে বার করে দেখাল। মিরিয়ন বললেন, আরে এটা তো একটা সীলের বাচ্চা। কোথায় পেলি? রোয়েনা এবার এক নিশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে ফেলে কাতর চোখে পিসির মুখের দিকে চাইল। মিরিয়ন বললেন, যা ভেতরে যা। সেঁক তাপ দে। আর দেখ, গরম দুধ একটু খাওয়াতে

পারিস কি না। আমি বাগানের কাজ সেরে আসছি।

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না রোয়েনা। উঃ! পিসি তুমি কী ভাল! আর আমি এতক্ষণ বোকার মতো কত কী-ই না ভাবছি।

মিরিয়ন বললেন, পাগলী কোথাকার। যা ভেতরে যা।

ব্যস্! সীল কন্যার জায়গা পাকা হয়ে গেল তাদের পিসি ভাইঝির ছোট্ট সংসারে। নাম হলো লোরা। বাড়ির অন্য পুষ্যিরা অবশ্য লোরাকে তেমন ভাল চোখে দেখেনি। গোটাকতক ছাগল-ছানা, হলুদ রঙের একটা বাচ্চা মংগ্রিল, এক জোড়া ভোঁদড়, পোষমানা দুটো কাঠবিড়ালী আর আদরের ইঁদুর রডনি এতদিন মৌরসীপাট্টা জমিয়ে রেখেছিল রোয়েনাদের বাড়িতে। হঠাৎ আর একজন এসে তাদের আদরে ভাগ বসাবে একি সহ্য হয়! রডনি তো আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, একে রাখা চলবে না, যেখান থেকে এনেছ সেখানেই রেখে এস। কিন্তু লোরা আস্তে আস্তে সকলকেই জয় করে নিয়েছে। লোরা যখন ওর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে তাকায় তখন ওকে আদর না করে কিছুতেই পারা যায় না। তাড়িয়ে দেওয়ার কথা আর ওঠে কখনো?

তারপর রোয়েনার তদারকিতেই বড় হয়ে উঠেছে লোরা। কাজটা যে মোটেই সহজ নয় তা দু একদিনেই বুঝেছিল রোয়েনা। দিনে চারবার একেবারে ঘণ্টা মেপে দুধের বোতল চাই নাহলে কান্না, ওর যখনই ইচ্ছে হবে তখনই ওকে কোলে নিয়ে বসতে হবে নাহলে কান্না, ওকে রোয়েনার বিছানায় শুতে দিতেই হবে নাহলে কান্না, বেড়াতে গেলে ওকে সঙ্গে নিতেই হবে নাহলে কান্না। তার ওপর কান্নার ধরনটি এমন যে কিছুতেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। প্রথমে একটু কাঁইকুঁই প্যানপ্যান, তারপরেই বাড়ি মাথায় করে গলা ফাটানো মড়াকান্না, যেন কেউ বেদম মেরেছে ওকে। তবে রোয়েনাও হাল ছাড়েনি। কিছুদিন পর রোয়েনা ভাবল লোরাকে জলে নামিয়ে দিলে বোধহয় ওর নিজের ওপর ভরসা বাড়বে, তখন আর এত আদুরেপনা করবে না। সত্যিই তাই। প্রথম দিন জলে নেমেই লোরা ওস্তাদ সাঁতারুর মতো সাঁতরাতে শুরু করে দিল। কী উৎসাহ! কী গতি! কে বলবে এই লোরাই খানিক আগে রোয়েনার পেছন পেছন টলমল করে হেঁটেছে আর কোলে ওঠার জন্যে বায়না করেছে।

এই ঘটনার পর ম্যাজিকের মতো বুদ্ধি খুলে গেল লোরার। সাঁতার কেটে বাড়ি ফিরে রোজ প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে তার ওপর বসে থাকত চুপটি করে যতক্ষণ না গায়ের সব জল শুকোচ্ছে। প্রথম প্রথম বারান্দার তাক থেকে চাদরটা পেড়ে বিছিয়ে দিতে হতো। একটু বড় হবার পর তারও দরকার হতো না। নিজেই পেড়ে নিয়ে সুন্দর করে বিছিয়ে বসত। কাজ করতে লোরার খুব উৎসাহ। মিরিয়ন আর রোয়েনা শহর থেকে বাজার করে ফিরলে সে-ই সব প্যাকেট নামায়, খোলে, বাজারের ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে রেখে দেয় ঠিক জায়গায়। পোস্ট অফিসের পিওনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসতে একদিনও ভুল হয় না। একদিন শুধু চিঠিগুলো নিয়ে বাড়িতে না এসে খাড়ির জলে নেমে গিয়েছিল সাঁতার কাটতে। সেই একদিনই। এমন ভুল আর কোনোদিন হয়নি।

কিন্তু এসব তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। লোরার আসল প্রতিভা দেখা গেল গান-বাজনায়। ও যেদিন প্রথম গান শুনেছিল সেদিনটার কথা রোয়েনা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। অনেকদিন পর পিয়ানোয় বসেছিলেন মিরিয়ন, রোয়েনা গাইছিল। দু এক লাইন গাইতে না গাইতেই পতপতিয়ে ছুটে এল লোরা। গান শুনে ওর সে কী আনন্দ! একবার ওদের পায়ের কাছে মাথা রাখে, একবার পিয়ানোর গায়ে কান পাতে। এই রকম ছটফট করতে করতে একটু পরেই কিন্তু ও আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল। গানের তালে তালে শুধু শরীরটা দুলতে লাগল এদিক ওদিক। গান থামাবার পরও বহুক্ষণ বসে রইল সেই একভাবে। যেন সুরের মধ্যে ও একেবারে হারিয়ে গেছে।

সীলেরা যে সুর ভালবাসে সেটা জানতো রোয়েনা। তা বলে এই রকম! পরদিন আবার গান গাইতে বসল রোয়েনা। লোরা খানিকক্ষণ শুনল, তারপর নিজেই গান ধরল। ঠিক গান নয় বেসুরো এলোমেলো চিৎকার। ঠিক যে হচ্ছে না তা বুঝতে পারলেও হাল ছাড়ছে না। রোয়েনা তখন ওর মাউথঅর্গানটায় খুব ঢিমে তালে একটা সহজ সুর ধরল। লোরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সেই সুরে গলা মেলাবার। বেশি দিন লাগল না। দু এক সপ্তাহের মধ্যেই ও নিখুঁত ভাবে তুলে নিল দুটো গানের সুর— 'বা বা ব্ল্যাকশিপ' আর 'ড্যানি বয়'। কথা বলতে না পারলেও সুর ফোটাল ঠিকঠাক। গান শেখার পর নজর পড়ল রোয়েনার মাউথঅর্গানটার ওপর। রোয়েনাও দেবে না, লোরাও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো রোয়েনাকে। মাউথঅর্গানটা মুখে নিয়ে খানিকক্ষণ চেবাবার পরও যখন সুর ফুটল না তখন ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লোরার। মাউথঅর্গানটা বেজে উঠল খুব জোরে। চমকে উঠে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল লোরা। তখন আর ওকে পায় কে। একবার ফুঁ দেয়। একবার শ্বাস টানে। মাউথঅর্গানও সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকে। দিনকতক কসরতের পরই কিন্তু দিব্যি সুর ফুটল ওর মাউথঅর্গানে।

এরমধ্যে রোয়েনার দুই বন্ধু ওদের বাড়ি বেড়াতে এসে লোরাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ফিরে গিয়ে তারা একজন একটা জাইলোফোন আর একজন একটা ট্রামপেট উপহার পাঠাল লোরাকে। লোরা তো আনন্দে আত্মহারা। ওর গান আর বাজনায় বাড়ি সর্বক্ষণ সরগরম। লোরার গানের খ্যাতি এত ছড়িয়েছে

লোরা তখন দিশেহারা। যে আজ ডাক পড়েছে অ্যান্ড্রু আঙ্কলের বাড়িতে।

লোরাকে নিয়ে রোয়েনা অ্যান্ড্রু আঙ্কলের বাড়ি পৌঁছাতেই সবাই হৈচৈ করে উঠল। তারপর আরম্ভ হলো সেই নামজাদা গাইয়ে ভদ্রমহিলার গান। সবে দু এক কলি গেয়েছেন তিনি লোরা সুর ধরল। নিচু থেকে ক্রমশ উঁচুতে উঠতে লাগল তার গলা। এমন তীক্ষ্ণ সুরেলা সীল কণ্ঠের সঙ্গে পাল্লা দেবে কে! ভদ্রমহিলা হতভম্ব হয়ে গান বন্ধ করলেন, লোরা গেয়েই চলল মনের আনন্দে। বেশ খানিকক্ষণ পর যখন সে থামল তখন শ্রোতারা বললেন, ওকেই আগে সুযোগ দেওয়া হোক। একজন এগিয়ে এসে লোরাকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলেন পিয়ানোর ওপর, যাতে সকলে ওকে দেখতে পান। লোরার সামনে দেওয়া হলো ওর জাইলোফোনটা। সম্মানের আতিশয্যে লোরা তখন দিশেহারা। অন্যদিন রোয়েনা ওকে একটু সাহায্য করে। আজ আর কোনো কিচ্ছুর প্রয়োজন নেই লোরার। বাজাবার কাঠিটা মুখে ধরে ও বাজাতে শুরু করল। বাজাতে বাজাতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে বাজনাটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। শ্রোতারা তখন প্রায় লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন, দারুণ দারুণ! আবার আবার! জাইলোফোনের পর মাউথঅর্গান। সেটা নিয়েও সেই এক কাণ্ড। ওদিকে গাইয়ে ভদ্রমহিলা আর বাজিয়ে ভদ্রলোক ততক্ষণে বেদম চটেছেন। অ্যান্ড্রু আঙ্কল পড়েছেন বিপদে। রোয়েনা তখন প্রায় জোর করেই লোরাকে তুলে নিয়ে চলে গেল অ্যান্ড্রু আঙ্কলের পড়ার ঘরে। দরজা বন্ধ করে ওর কানে কানে বলল, এমন করে না সোনা। ওঁরাও তো গাইবেন। তুমি এখানে বোস। আগে ওঁদের গান শেষ হোক তারপর তুমি আবার গাইবে।

কিন্তু তা কি হয়? বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়েও গানের সুর ভেসে এল লোরার কানে। আর যেই না আসা লোরা অমনি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। এত চোখের জল কোথায় ছিল কে জানে! মনের দুঃখে বুক ভাসিয়ে কেঁদেই চলল লোরা। শেষ পর্যন্ত শ্রোতারাই এগিয়ে এসে বেচারাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। আবার বসিয়ে দিলেন পিয়ানোর ওপর। শিল্পীরাও ততক্ষণে হার স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন উৎসাহী গাইয়েকে কি আটকানো উচিত! রোয়েনা সঙ্কোচে মাটিতে মিশে গেলে কী হবে অ্যান্ড্রু আঙ্কলের গানের আসর একাই মাত করে দিয়ে সদর্পে বাড়ি ফিরে গেল গরবিনী লোরা।

ছবি : বিজন কর্মকার

রোয়েনা ফারীর 'সীল মর্নিং'-এর অংশবিশেষ অবলম্বনে।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফসেটে ছাপা

আফ্রিকার ভয়াল ও ভয়ঙ্কর অরণ্যের অধিবাসী জন্তুদের চরিত্র, প্রকৃতি এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সম্বলিত—

সঙ্কর্ষণ রায়

আফ্রিকার বন্যপ্রাণী

রঙীন ছবিতে পরিপূর্ণ বইটির দাম ১০ টাকা

বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চার ॥ মানবেন্দ্র পাল ৯·০০

ছোট-বড়-সবার মনের মত বই

অদৃশ্য জলদস্যু

অনিল ভৌমিক

দাম : ৯·০০

এ-যুগের কয়েকজন দুঃসাহসিক ভারতীয় নিজেদের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে "পাতালপুরী" অভিযানে গিয়ে সমুদ্রতলের এক রহস্যময় দুর্গ আবিষ্কার করল—যে দুর্গ তৈরী করেছিল নিবাত কবচ নামের তিন কোটি অসুর—

পাতালপুরী অভিযান

শিশিরকুমার মজুমদার ৭·০০

লেখকের আর একটি বই

গোগাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ৯·০০

কালিকটের নিকটবর্তী এক গ্রামের পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ একদিন দেখা গেল এক রহস্যময় লাল আলো। রোজ সন্ধ্যেবেলায় প্রায় দু ঘণ্টা ধরে জ্বলত এই আলোটা, শুধু মাসের মধ্যে দু একদিন লালের বদলে দেখা যেতে সবুজ আলোর আভা। এক কিশোর বৈজ্ঞানিক ও তার দুই সহচর কিভাবে জড়িয়ে পড়ল এই আলোর রহস্যে আর কিভাবে উদ্‌ঘাটন করল চমকপ্রদভাবে এক দুরন্ত রহস্যের জট, তাই নিয়েই এই শ্বাসরুদ্ধকর কিশোর রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

পাহাড়ে আলো জ্বলে দেবল দেববর্মা ১৪·০০

লেখকের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আর একটি কিশোর উপন্যাস

ছটি সংখ্যা—৯, ৬, ৩, ৩, ৬, ৯, এই সংখ্যা থেকেই সূত্র পাওয়া গেল রতনের।

নিখোঁজ রতন ১০·০০

পৃথিবীর সবচেয়ে বেপরোয়া অভিযাত্রীর কাহিনী

মুছে গেল পদচিহ্ন

নির্বেদ রায়

দাম : ৮·০০

অভিশপ্ত চুনার ॥ প্রলয় সেন ৭·০০

সোনার নদীর রাজা ॥ ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৫·০০

কাবুল আর টাবুল	॥ প্রফুল্ল রায়	৭·০০
হারে-রে-রে	॥ মহাশ্বেতা দেবী	১২·০০
আবিস্কারের গল্প	॥ শচীন দাস	৯·০০
রক্ত মাখা গুপ্তধন	॥ সুজিতকুমার সেনগুপ্ত	৯·০০
কালনাগিনীর আক্রোশ	॥ সংকর্ষণ রায়	৬·০০
রক্তপ্রবাল	॥ ঐ	১০·০০
ভজগোবিন্দের	॥ শঙ্কর রুদ্র	১ম ৮·০০
অ্যাডভেঞ্চার		২য় ১২·০০

প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে গোরাচাঁদকে, সমাজের নিচু তলা থেকে উঠে আসতে হয়েছে লড়াইয়ের আসরে, ডান হাতে তার যেন বজ্র। রাজুদার স্বপ্ন পারবে কি সে সফল করতে...ছড়িয়ে পড়বে তার নাম! বাচ্চা বয়স থেকে কৈশোরের সেই রক্তাক্ত সংগ্রামের কাহিনী। রোমাঞ্চকর অথচ মর্মস্পর্শী।

গোরাচাঁদ মঞ্জিল সেন – ১২

বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা

অরণ্যের ডাকে

দিলীপ ভট্টাচার্য ১২·০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা–৭০০ ০৭৩

অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ ? কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ?

পেটের গোলমাল ?

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গণ্ডগোল
ও অসুস্থ লিভার। যদি সুস্বাস্থ্য চান —
পেটের গোলমাল সারান
আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

... ডাঃ সরকার

পেটের গোলমাল সারাতে
আর লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার—
আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

লিভোসিন

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে **লিভোসিন** এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না-বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর লিভার সুস্থ হয়।

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Jupiter -এর
আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোনঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪

Jupiter · Emars · Allen · allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india **Allen's India**
Marketing Pvt. Ltd.
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India